তুলির কিছু সময়

কণা বসুমিশ্র

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩,

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৬৪

প্রচ্ছদ : শ্রীঅতি দাস

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

আমার বাবা স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ বসু

ও

আমার মা শ্রীমতী বাণী বসুকে

সূচীপত্র

তুলির কিছু সময়

কেন লিখি—

সবার মধ্যে থেকেও নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ লাগত। ছোটবেলা থেকেই একবুক যন্ত্রণা। বুঝতে পারতাম না, কেন? বাড়ীতে দাদা দিদিরা, স্কুলে বন্ধুরা, তবু। যে বয়েসটা শুধু হই হই করার বয়েস, শুধু হেসে খেলে কাটিয়ে দেবার বয়েস, সেই বয়েসে কেন একা মনে হত নিজেকে জানি না। একেক সময় এমন হত যে, দারুণ কান্না পেত। গণেশঘাটে পাথরের ওপর বসে যখন নদীর ডাক শুনতাম, বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ত অজস্র কান্নাব ঢেউ। বাড়ীতে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে অথবা অন্য কোথাও ভিড়-ভাট্টার মধ্যে গেলে এই একাকিত্বের তীব্রতা যেন আরো বেড়ে যেত। আমার এই অন্তর্মুখী মন কিংবা নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা কাটানোব জন্যেই চেঁচিয়ে কবিতা পড়া, গান করা ছিল আমার হাতিয়ার। জন্মেছিলাম আসামের এক ছোট শহরে। নাম তেজপুর। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে এই শহর। তার কোল ঘেঁষে নদীর ধার দিয়ে ছোট ছোট কিছু পাহাড়। এই প্রকৃতিও তো ছিল মন খারাপ করার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের বাড়ীটা ছিল লেকের পাড়ে। আমি যে ঘরে পড়তাম, সে ঘরের জানলা খুললেই সকাল বেলার একরাশ আলো। সন্ধ্যেবেলা সেই আকাশেই অজস্র তারা। সেই সোনা-গলা ঝলমলে রোদ্দুরে দেখতাম হাজার পদ্মফুলের মেলা, হাঁসের ডানার ঝটপটানি। লেকের পাড় দিয়ে চওড়া পীচের রাস্তা, যার পাশের পার্কে একটা চাঁপা গাছ। সেই গাছের তলায় একশো আটবার পাক দিত সম্ভ্রান্ত ঘরের এক প্রৌঢ় পাগল। তার বাড়ীর লোকেরা তাকে মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে যেত। বইয়ের পাতায় চোখ না রেখে আমি সেদিকেই তাকিয়ে থাকতাম অবাক বিস্ময়ে। বাবা মায়ের গলার আওয়াজ পেলেই চোখ চলে যেত বইয়ের পাতায়। বাড়ীতে কাজ করত নির্মলের মা। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখন তার বিড়ির নেশা পেত, সে পালিয়ে এসে বসত পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা বারান্দার ওই ছোট্ট ঘরের কোণে। বিড়িতে আগুন ধরিয়ে সে গল্প শোনাতো, তার বুড়ো প্রথম স্বামী আর জোয়ান দ্বিতীয় স্বামীর গল্প। কিছু বুঝতাম, কিছু বুঝতাম না। কিন্তু তার জীবনযন্ত্রণা আমার মনকেও ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত। ভাল লাগত না একেকদিন সন্ধ্যে বেলায় যেদিন বাবা পড়াতে বসতেন।

সেই সময় রেলের হুইসেল বাজত, বর্ষার অশান্ত ব্রহ্মপুত্র পাড় ভেঙে ভেঙে বহুদূর পর্যন্ত তার অস্তিত্ব ঘোষণা করত। সে গর্জনে আমার বুকও কেঁপে কেঁপে উঠত। তখন মন বসত না অঙ্কের খাতায়, কিম্বা চাইল্ডস ইজি গ্রামারে। ওদিকে অবজারভেটর হিল, টাইগার হিল, ভোমরাগুড়ি পাহাড়, এদিকে এই ব্রহ্মপুত্র। ছোটবেলা থেকে আমার মন জুড়ে ছিল এই প্রকৃতি। 'ঢেউ' গল্পের মধ্যে দিয়ে আমি সেই ছেলেবেলার আমাকেই যেন খুঁজে খুঁজে ফিরেছি। যে ছিল ভাবুক প্রকৃতিপ্রেমিক। কোথাও যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারত না। যখন নায়ক তাকে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখিয়েছে তখন তার মনে পড়ে গেছে সেই নদীর কথা, সেই প্রকৃতির কথা, সেই খালাসী কুদ্দুস মিঞার কথা। যে তাকে সমুদ্দুরের স্বপ্ন দেখাত। সেই কুদ্দুস মিঞা যেন জাহাজের খালাসী মাত্র নয়। সে প্রকৃতির দূত, সে মুক্তির পারাবত। 'রুনিয়া শুনল, জাহাজের বাঁশী, বর্ষায় পাড় ভাঙা ক্ষ্যাপা নদীর ডাক, সেই মাতাল নদীর ঢেউয়ের ওপর আছড়ে পড়ছে ইস্ত্রফ্ল্যাট, পাটাতনের ওপরে নমাজ পড়ছে কুদ্দুস মিঞা। বলছে, 'সমুদ্দুরে যাবা না? ভয় ক্যানে?' শুধু 'ঢেউ' গল্পেই নয়, আমার বিভিন্ন গল্পেই এই প্রকৃতি এসেছে বার বার, যে শুধু মানুষকে মুক্তির নিশান দেখিয়েছে। আমার বাবা ছিলেন একজন বড় আইনজীবী। ওকালতী ছিল তাঁর পেশা। নেশা নয়। নেশা ছিল পড়া আর পড়ানো। বাড়ীটা ছিল যেন একটা লাইব্রেরী। তার ঘরে ঘরে অসংখ্য বই আর বই। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান কিছু বাদ নেই। স্যার আশুতোষের এককালীন প্রিয় ছাত্র আমার বাবার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। মন ছিল রোমান্টিক। বাবার সাহিত্যপিপাসু মন এবং রোমান্টিক মেজাজ ওকালতির পক্ষে যা মোটেই অনুকূল ছিল না। তবু তিনি যখন কালো কোটটি গায়ে চাপিয়ে কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতেন, তখন তিনি একজন বাঘা উকিল। মক্কেলের ভিড় যখন থাকত না, তখন তিনি বই খুলে বসতেন, নইলে আমাদের নিয়ে সাহিত্যের পাতায়। আমাদের সেই আসরের সঙ্গী হতেন মাও। বাবার হাত ধরে নদীর ধার দিয়ে যখন হাঁটতাম, বাবা কানের কাছে তর্জমা করে যেতেন বাংলা কবিতার ইংরিজী লাইন, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'—প্যাটার প্যাটার গোজ দা রেন। আরেকটু বড় হলে শুনেছি শেলীর স্কাইলার্ক, ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্কাইলার্কের পার্থক্য। প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিংকিং-এ বিশ্বাসী আমার বাবা বলতেন, তোমরা শুধু পড়, জানো।

সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের কবি, লেখকদের তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরতেন। কোর্ট থেকে ফেরার পর তাঁকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, ওকালতি আমি ছেড়ে দেব। ক্রিমিন্যাল কোর্টের এসব নোংরামি আমার ভাল লাগে না। কিন্তু এই বাবাই পরে বড় হলে আমায় বন্ধুর মতন শুনিয়েছেন কত মামলার কাহিনী। মানুষের মনের চোরা গলিতে কত পাপ, অশান্তির দাবানল। বাবার হাত ধরে চলতে চলতেই আমি একদিন দেখেছিলাম, নামকরা পকেটমার, গুণ্ডা শুক্রকে। দেখেছিলাম রায়-বাড়ীকে, সিংহাসনকে, দেখেছি মাড়োয়ারী মক্কেল হনুমানবাবুকে। এই রায়বাড়ীকে নিয়েই আমি লিখেছিলাম 'ঘুঘু দেখানো' গল্প। যে গল্প লিখে (১৯৬১ না ১৯৬১ মনে করতে পারছি না) আমি প্রথম হয়েছিলাম লেডী ব্রাবোর্ন কলেজে অনুষ্ঠিত আন্তঃ কলেজ ছোট গল্প প্রতিযোগিতায়। এই গল্পের আত্মভোলা উকিল চরিত্রটি আমার বাবার।

ছোটবেলায় কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাই না দেখেছি। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। এক বর্ষার রাতে দরজার কড়া নড়ে উঠলো। নাগা চাকর ওয়াইম্যান, যার নাকের ওপরে এবং থুতনিতে লম্বা চওড়া উলকির দাগ, সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো, কে?—বাবুকে ডেকে দে।—চেনা মক্কেলের মুখ দেখে বাবা আশ্বস্ত হয়ে দরজা খুলতে বললেন। দরজা খুলতেই বাবা চমকে উঠলেন। তার হাতে কচুপাতায় মোড়া একটা মানুষের মাথা, হাতে রক্তমাখা ভোজালি। লোকটা বললো, দুশমনকে খতম করলি বাবু, মোকে বাঁচায় দে।

মানুষের এইসব অপরাধ ছেলেবেলায় আমার মনকে বড় নাড়া দিত। কিন্তু মানুষের মনের ভাষা, মানুষের বুকের ভাষা নিয়ে লিখতে শিখিনি তখনো। আমার আত্মকেন্দ্রিক মন শুধু নিজের বিভিন্ন অনুভূতির কথাই খাতার পাতায় হিজিবিজি এঁকে যেতো। আমাদের বাড়ীটা ছিল যেন একটা বোর্ডিং হাউস। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো মিলে অনেক ভাই-বোনের অভিভাবক ছিলেন আমার বাবা, মা। শুধু তাই নয়, চা বাগানের অনেক দুঃখী ছেলে-মেয়ে ও যাদের লেখাপড়ায় অসুবিধে ছিল তারা মানুষ হয়েছে ও-বাড়ীতে। বাবা মার মধ্যে দেখেছি পরকে আপন করার আশ্চর্য উদারতা। বাবার দুঃস্থ কুলী মক্কেলরা উকিলবাবুর বাড়ীর বারান্দায় রাত কাটাতো। চার বেলার উদরপূর্তি ওখানেই চলতো। হোটেলে যাবি না? বাবা প্রশ্ন করলে তারা একগাল হেসে বলতো, আপনি ধেমালি (ঠাট্টা) করছিস বাবু? হোটেলে যদি যাবি তো তুই

আছিস কেনে?

প্রচুর পয়সা রোজগার করেছেন বাবা। কিন্তু পয়সা চেনেননি। বাবার মতন মা'ও শুধু খরচই করেছেন পরের জন্যে। এই পৃথিবীর খেলাঘরে তাঁরা যেন ছিলেন দুই শিশু, যাঁরা স্বার্থপর হতে শিখলেন না। মানুষের প্রতি মা-বাবার এই অপরিসীম সহানুভূতি এবং ভালবাসা বোধহয় রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাই লিখতে বসলে মানুষের তুচ্ছতার দিকে মন টানে না। আমি খুব বড় মানুষকে খুঁজে বেড়াই। একজন নিষ্ঠুর মানুষের মধ্যেও আমি দেখতে পাই একজন ভালবাসার মানুষ। তার দোষ ত্রুটি, তার পদস্খলন সত্ত্বেও সে যে একজন মানুষ, সেকথাই আমার কলম এঁকে চলে। সেই মানুষের আত্মদহন থাকে, থাকে আত্মবিশ্লেষণ।

মানুষের মধ্যে চলেছে এক চিরন্তন অনুসন্ধান, সে কি চায়? কোন কিছুতেই যে তৃপ্ত নয়, শুধু অপূর্ণতার হাহাকার, সেই দুঃখী মানুষটির কথাই আমি লিখে চলি। ছোট ছোট সুখ ছোট ছোট আশা খুব বেশীক্ষণ যাকে বেঁধে রাখতে পারে না, তার বড় মন তাকে শুধু হাতছানি দেয়। ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতার উর্ধ্বে সেই নির্লিপ্ত, একা, নিঃস্ব মানুষটি হয় আমার গল্পের বিষয়।

সাহিত্যকে এই পরিবর্তনশীল যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়। সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য নয়। যুগে যুগে সাহিত্যের ভাষা বদলায়, চরিত্র বদলায়, বদলায় মানুষের ধ্যান, ধারণা, বিশ্বাস এবং বোধের পৃথিবী।

কিন্তু এত সব বদলের পরও সাহিত্যে এমন কিছু থাকতে পারে, যা কোন বিশেষ কালের নয়, যা চিরকালের মানুষের অনুভূতি। লেখকের দায়িত্বও অনেক। সমাজের হুবহু চিত্ররূপ তুলে ধরা লেখকের কাজ নয়। একজন সৎ লেখক অবশ্যই সমাজের ভাল এবং মন্দের বিচারক। সাহিত্যে সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবিতে থাকে লেখকেরই একান্ত ভাললাগা মন্দলাগার অনুভূতি। যেখানে লেখক শুধু বিচারকই নন। তিনি সমাজের, পাঠকের একজন দরদী বন্ধু। তিনি পথপ্রদর্শক। মানুষ কোন মানসিকতায় কোন কাজ করে, একজন লেখক হিসেবে আমি সে কথাই তুলে ধরি। তাই সামাজিক জীবনের অবক্ষয়ের যন্ত্রণা যখন যুবক শ্রেণীকে বিপথগামী করে, তখন তাদেরই এক যুবকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'কাজল বলছে, মেমসাহেব, জীবনটাকে চেখে চেখে দেখছি। কিছু ভাল লাগে না। কিস্যু না। বোমা মেরে দেখলাম, চাকু মারলাম। ছিনতাই? তাও করলাম। হাজত বাস করলাম কতবার। মেয়েদের সঙ্গে

একটু ইয়ে-টিয়ে করেও দেখলাম, কিছু ভাল লাগে না। তাই এখন গাঁজা টানছি, ভাঙ টানছি, আর বাপ দাদার পকেট মেরে টু পাইস জমিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি।' (মাসু, কাজল ও আরও কয়েকজন)। সাহিত্য নীতিকথা নয়, নয় আদর্শের দলিল। যদিও সাহিত্য দিতে পারে এই অন্ধকার হতাশাময় জীবনে কিছু আলোর প্রতিশ্রুতি। তাই জীবনের প্রতি যার প্রবল বিতৃষ্ণা সেই কাজলের চেহারার পরিবর্তন দেখছে মাসু। 'ওদিকে সূর্য উঠছে। পূব আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে কমলালেবুর গাঢ় রঙ। দু পাশে মহাসমুদ্রের মতন নীল পাহাড়।···দূরবীনের মধ্যে দিয়ে মাসু দেখছে কাজলকে। ওর সারা কপালে এলোমেলো চুল। ওর নেশাধরা লাল চোখ। চোখের কোণে কালির প্রলেপ। হয়ত কত রাত জাগার চিহ্ন। ওর পান খাওয়া ছোপধরা ঠোঁটে ফুটে উঠছে ভালবাসার হাসি।'···

স্কুলের হাতে লেখা ম্যাগাজিন 'ঝংকারে' বেরিয়েছিল আমার প্রথম লেখা একটি ভূতের গল্প। তারপর কয়েকটি গল্প ছাপা হয়েছিল মাসিক বসুমতীতে। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সন পর্যন্ত। যদিও তা নিতান্তই অপরিণত ছেলেমানুষী মনের স্বাক্ষর। আসলে তখনো আমি পথ খুঁজে চলেছি। আমি কি বলতে চাই তখনো আমার অজানা। আমার বুকের অসহ্য বোবা যন্ত্রণাকে কাটানোর জন্যে আমি যে অনেক রকম ভাল লাগার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাইতাম, লেখা ছিল তারই মধ্যে একটি। স্কুলে কমিক, প্যারোডি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা সব কিছুতেই থাকতো আমার নাম। কাপ, মেডেল না নিয়ে আমি খুব কম প্রতিযোগিতা থেকেই ফিরেছি। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল কলকাতার কলেজে পড়তে এসেও। ফলে ছাত্রজীবনে ছিলাম শিক্ষক শিক্ষিকা অধ্যাপক অধ্যাপিকা মহলে অত্যন্ত প্রিয়।

এইসব সাফল্য সাময়িকভাবে আমার মনকে স্পর্শ করলেও মনের অতৃপ্তি কিংবা মন-কেমন-করা সেই ব্যাধি থেকে আমায় অব্যাহতি দেয়নি। তেজপুরে স্কুলের পাঠ চুকিয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে এগোই। বালীগঞ্জে কলেজ। সামনেই লেক। বন্ধুরা শোনায় তাদের জটিল জীবনের কথা। যৌবনের তোড়ে ভেসে যাওয়া জীবনের কাহিনী। একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে নিয়েই যত গণ্ডগোল। কখনো একের জায়গায় এসে যায় দুই। সেই এক কিংবা দুইকে কেন্দ্র করে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। মুরলীধর গার্লস কলেজের সেই বন্ধুদের মুখগুলো মনে পড়ছে আজ কয়েক বছর পর। জানি না আজ

তারা কোথায়? তাদের মুখে শোনা কত আশ্চর্য কথা, কত হৃদয় আন্দোলন আজও আমার অনেক গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তখনো লিখেছি। লিখে লিখে তাদের শুনিয়েছি। অন্য মেয়েরা যখন টেবল টেনিস খেলায় ব্যস্ত কমন রুমে, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ কলকাতার আকাশে আগুন ছড়িয়েছে, সেই তখন ছাদের আলসেয় ভর দিয়ে আমি গল্প পড়ছি, আর আমার সামনে বসে আমার গল্পের নায়িকা কাঁদছে। সে বলছে, কণা, তুই কি করে আমার মনের ব্যথা বুঝলি রে! যদি কোনদিন আমার কথা ছাপিস, আমার নাম ধাম সব বদলে দিস। আমায় যেন কেউ চিনতে না পারে।

সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল আমার লেখা। যদিও সে লেখার জন্ম হয়নি বাস্তবে। তা হয়েছে আরও পরে ১৯৬১ সনে আমার বি-এ পরীক্ষা দেবার পর। রোমান্টিক মনের গতি-প্রকৃতি, প্রেমের বিচিত্র রূপ যা আমার আজও অধিকাংশ গল্পেরই বিষয়বস্তু। মানুষের মনের গভীরে যে রহস্য আছে, তাই হল আমার জিজ্ঞাস্য। অদ্ভুত মানুষের মন, সে যে কেন বদলায়, আর কেনই বা একজনের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, বিকিয়ে দেয়, কেউ জানে না। মানুষ কেন এমন হয়, আমি সেই মানুষের মনের অতল তলে হাতড়ে বেড়াই, কিছু পাবার আশায়। অস্থির যৌবন যা আপাতদৃষ্টিতে নিন্দনীয়, আমি সেই যৌবনের কান্না বুঝতে চেষ্টা করি। সে কান্না শুধু যুবক বয়েসেরই নয়। বার্ধক্যেও যাদের যৌবন ফুরোয় না। এসব কথা তখন অনুভব করেছি। কিন্তু প্রকাশের ভাষা পাইনি। অপ্রকাশের যন্ত্রণা আমায় শুধু কুরে কুরে খেয়েছে।

একদিন ক্লাশের এক বন্ধু বললো, তুই লিখে টাকা পাস না?

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। লিখে যে টাকা পাওয়া যায়, একথা কে জানত!

বললাম, না তো!

বন্ধু বললো, একদিন যা না বসুমতী আফিস?

থাকি দক্ষিণ কলকাতায়। কলেজও দক্ষিণ কলকাতায়। মধ্য কলকাতা চিনি না। গল্প তো পোস্টে পাঠাই।

বন্ধু বললো, আমিই নিয়ে যাব তোকে।

ব্যস্ত ছিলেন প্রাণতোষ ঘটক। তবু বন্ধুর কথার উত্তরে বললেন, তুমি কে? কণা বসুর হয়ে ওকালতি করতে এসেছো? আমার সহপাঠিনী সগর্বে

বললো, আমি ওর বন্ধু। তারপর আমায় দেখিয়ে বললো, এই যে কণা বসু।

প্রাণতোষ ঘটক অবাক হলেন। একটু হেসে বললেন, বোসো। আমি ভেবেছিলাম আরও বয়স্ক কেউ। আমরা নূতন লেখকদের টাকা দিই না। টাকা দেব আরও পরে। যদিও তার পরের লেখা ছাপা হবার পরই, মনি অর্ডারে দশটি টাকা এসেছিল। টাকা সেদিন অন্তর থেকে সত্যি চাইনি। লেখাটা ছাপা হলেই ধন্য হয়ে যেতাম। আমার ছাপার অক্ষরে নাম, আর গল্পটার ওপরে কতবার যে হাত বুলোতাম।

বন্ধুদের মধ্যে যারা সিনেমার বই নিয়ে বসে থাকতো লাস্ট বেঞ্চে, অধ্যাপিকাদের একবর্ণও কানে তুলতো না, তাদেরই মধ্যে একজন একদিন বললো, সিনেমার কাগজে লেখা দে। কত লোক পড়বে।

সিনেমার কাগজ? ওদিকে তেজপুর থেকে বাবার চিঠি আসছে, 'প্রেমের গল্প ছাড়িয়া অন্যান্য মানবিক অনুভূতি লইয়া গল্প লিখিতে চেষ্টা করিও।'

কিন্তু সিনেমার কাগজে গল্প লেখা মানেই তো প্রেম! কার প্রেমের গল্প লিখবো? চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, কত ঘটনাবহুল জীবন। কিন্তু কিভাবে শুরু করব? যে সব বন্ধুদের কথা লিখে লিখে ছিঁড়েছি এতদিন, তাদের কথা তো ছাপার উপায় নেই। যদি কেউ চিনে ফেলে তাদের! অতএব এক বন্ধুর দিদিকে কেন্দ্র করেই লিখলাম একটি গল্প। যার জীবনে দুই নায়ক। ১৯৬৫ সনের আগস্ট। আমি বেরিয়ে পড়লাম উল্টোরথ অফিসের উদ্দেশ্যে। ওখানকার এক কর্মীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এক আত্মীয়ের বাড়ীতে মাত্র ক'দিন আগে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন লেখা ছাপার। গল্পের বিভাগ তখন রবি বসুর হাতে। আলাপ হল রবিদার সঙ্গে। ভদ্রতাবশত বসতেও বললেন। কিন্তু গল্পের ব্যাপারে কোন আগ্রহই দেখালেন না। উনি বললেন, গল্প তো অনেকেই দেয়। সবার লেখা কি ছাপা হয়? ঠিক আছে ভাই, রেখে যাও পড়ে দেখবো।

টেলিফোনে যে পরদিনই আমার ডাক আসবে ভাবতে পারিনি। কিন্তু গায়ে তখন আমার জ্বর।

আমার খুড়তুতো দাদাদের বাড়ীতে থেকে কলকাতার ছাত্রজীবন কেটেছে। তাদের ওপরে দায়িত্ব দিয়েছিলেন বাবা, পড়াশুনো শেষ না করে আমি যেন এভাবে লেখা নিয়ে মেতে না থাকি। অতএব তখন আমার রীতিমতই পরাধীন জীবন। কিন্তু নিজেকে স্বাধীন ভাবতে তো কোন বাধা নেই? থাকলোই

বা অভিভাবকের কড়া নিষেধ, যখন তখন বেরোবে না। লেখার পোকা যার মাথায় ঢোকে, বাধা-নিষেধের গণ্ডী ভেঙে তাকে যে চলতেই হবে। সেদিন বাড়ীতে কাউকে কিছু না বলে এইট-বি'তে চেপে সোজা মাণিকতলা। রবিদার সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, বোসো, তোমার লেখার হাত চমৎকার। তোমার মধ্যে সম্ভাবনা আছে। গল্পটা ছাপা হবে। কিন্তু ভাই আমার একটি প্রশ্ন, তোমার গল্পের দুটি নায়কই এতো ভালো, তা নায়িকা বিনা দোষে সুগতকে ত্যাগ করছে কেন? তুমি এই দুই নায়কের মধ্যে একজনকে ভিলেন করে দাও।

বাড়ীতে ফিরেই টের পেলাম গায়ে বেশ জ্বর। একটা নোভালজিন ট্যাবলেট খেয়ে লিখতে বসলাম। আমার খুড়তুতো দাদা আমায় উৎসাহ দিতো খুবই। তবু বাবার নীতিতে সেও ছিল বিশ্বাসী, পড়াশুনো বাদ দিয়ে লেখা নয়। রাত জেগে লিখলে শরীর খারাপ হবে, লাইট জ্বেলে রাখলে অনেকের ঘুমের অসুবিধে হবে। তাই বাড়ীতে হুকুম ছিল তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। কিন্তু ঘুম আর আসে না। দুজন নায়ক আর সেই দিশেহারা নায়িকা আমার মনের মধ্যে বার বার এসে দাঁড়ায়। এক সময় সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি চোরের মতন নিঃশব্দে কাগজ আর কলম নিয়ে বাথরুমে চলে গেলাম। তারপর চৌবাচ্চার মাথাটাকে চেয়ার করে দেওয়ালটাকে টেবিল বানিয়ে দিলাম। দেওয়ালের গায়ে খাতা রেখে লিখছি। কোন নায়ককেই ভিলেন করতে ইচ্ছে হয় না। ভাবছি, দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু ঘটাবো কি না। তাতেও মন সায় দেয় না। আমি দুর্বল লেখক হব কেন? মৃত্যু তো হাতের শেষ অস্ত্র। তার চেয়ে অন্য কিছু? তবে কি নায়িকার মতিস্থিরতা নেই? লিখতে শুরু করলাম কিন্তু এই দুটি কারণের একটিও মনঃপূত হয় না। কেবলই মনে হতে থাকে, ভালবাসা কি কোন ছকে-বাঁধা নিয়মে চলে? একই মন কি দু-জনকে দেওয়া যায় না? নায়িকা ঊর্মির জন্যে মনটা কেমন করে উঠলো। অথচ তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দু-জনের মধ্যে কে থাকবে আর কেই বা যাবে? লেখা শেষ হল। সেই প্রথম আমার হাতে জন্ম হল একটি পরিণত প্রেমের গল্পের। কিন্তু প্রেসে দেবার আগে, যাকে নিয়ে লেখা সেই বন্ধুর দিদিকে একবার পড়ে শোনানোর ইচ্ছে হল। পরদিন তার সামনে সত্যি সত্যি পড়ে ফেললাম লেখাটা রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউট অব কালচার-এর ভিজিটারস রুমে বসে। পড়া শেষ হলে তার আইলাইনার আঁকা চোখের পাতাগুলো ভিজে উঠেছিল কিনা জানি না। তবে সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে

পড়েছিল। বলেছিল, লেখাটা ছাপা হলে তোমার তো নাম হবে। কিন্তু আমার যে কদিন পরই বিয়ে। এটা ছিঁড়ে ফেললেই ভাল হয়।

ছিঁড়তে গিয়ে বুকের মধ্যে বেজেছিল। তবু ছিঁড়েছিলাম। তারপর অনেকদিন পর আর একটি গল্প লিখে রবিদাকে দিয়েছিলাম। ছাপা হয়েছিল সিনেমা জগতে। তার নাম 'বরফের দেশে'।

কয়েক বছর পর গল্পটা আবার লিখেছিলাম। নাম 'উর্মি'। ছাপা হয়েছিল দেশ পত্রিকায়। কিন্তু দ্বিতীয়বার লেখার সময় নায়িকা উর্মির জন্যে আমার মন অতোটা কাঁদেনি যেন, প্রথমবার যেমন কেঁদেছিল। তবুও তার জন্যে আমার ছিল সহানুভূতি। তাই একজন নায়ককে কাছে পেয়েও তার মন আর একজনের জন্যে কাঁদে। তখন সে ভাবে "আমাদের মনটা যেন দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম। সে শুধু দোলে আর দোলে। কোথায় থামতে হয় জানে না।"

আমার জীবনে বন্ধুদের ভূমিকা অনেক। তারা আমার পাণ্ডুলিপির শ্রোতা। তারা আমার সমালোচক। যদিও তাদের সেই সমালোচনা আমায় সাহিত্যবিমুখ করেনি কখনো। বরং সাহিত্যমুখীই করেছিল। সম্পাদকের অবহেলা বুকে বেজেছিল দিনের পর দিন। কলকাতা শহরের পত্রিকা অফিসগুলো আমি এর পর একে একে চিনতে শুরু করেছিলাম। কখনো দারুণ হতাশায় মন ভরে যেতো। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর যখন দেখতাম, লেখা ছাপা হয়নি। লেখাটা ফেরৎ এসেছে। অথবা তারা হারিয়ে ফেলেছে। অনেক সময় অনেকের কাছেই শুনতে হয়েছে, মেয়েরা আর কি লিখবে? কেন, মেয়েরা কি লেখে না? আমি অবাক হয়ে ভেবেছি, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, জেন অস্টেন, আশাপূর্ণা দেবী, কবিতা সিংহ প্রভৃতি এঁরা কি লেখেননি? বা লিখছেন না? শুনতে হয়েছে, তুমি তো ছেলেমানুষ, জীবন সম্বন্ধে কতখানি অভিজ্ঞতা আছে তোমার? আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে ভাবছি, সত্যিই সেদিন অভিজ্ঞতা কতটুকু ছিল আমার? কিংবা সেদিনের অভিজ্ঞতার রূপ আমার কাছে আজ অন্য রূপ নিয়েছে। তবু মন কেঁদেছে। মনের ভেতরে একটা প্রবল তাড়না অনুভব করেছি। বুঝেছি, না লিখে আমার উপায় নেই। আমি লিখেছি। আজও লিখছি। তবে আমি তাকিয়ে আছি, অনেক অভিজ্ঞতার ভিড়ে পোড়-খাওয়া সেই বয়েসের আশায়। সদ্য তিরিশে পা দেওয়া এই অভিজ্ঞতার সীমিত জীবন একদিন তার পরিধি বাড়াবে। তখন

আমি আরও লিখবো। কারণ, আমি আশাবাদী।

ছোটবেলা থেকেই দেখছি, বাড়িতে 'দেশ' আসছে। ওখানে সব মানী এবং দামী লেখকরা লেখেন। বড় লোভ হতো আমার লেখাও ছাপা হোক দেশে। বন্ধুরা বলতো, তোর তো এখনও নাম হয়নি। দেশ তোকে এখন পাত্তাই দেবে না। কিন্তু যেখানে নিষেধ সেখানেই তো মন ছোটে বার বার। ১৯৬১ সনে প্রথমে কোন একদিন ইউনিভার্সিটিতে না গিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিলাম আনন্দবাজার অফিসে। দেশ পত্রিকার ঘরের সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। চিনি না কাউকেই। আজ যিনি পঙ্কজদা নামে পরিচিত তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম বিনয়ের সঙ্গে, সাগরময় ঘোষ কোথায়?

কেন?—আমি একটি গল্প দিতে চাই। উনি বললেন, গল্প তো দেখেন বিমল কর। তিনি এখনো আসেননি। আসবেন বেলা একটায়।

ফিরে গেলাম লিফটের সামনে। মনে হল, এখান দিয়েই তো যাবেন সেই গল্পের বিচারক! তখন সবেমাত্র বিমল করের খড়কুটো পড়েছি। বিমল কর বড় প্রিয় লেখক হয়ে গেছেন আমার। তবু কেন যেন আমার ধারণা ছিল বেশ মোটাসোটা কালো মতন এক ভদ্রলোক, যাঁর নাম বিমল কর। বেলা এগারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলাম। কতজনকেই তো আসা যাওয়া করতে দেখলাম, কিন্তু সেই কল্পিত চেহারার লেখক আর এলেন না। সেই ভদ্রলোককে (পঙ্কজদা) ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আবার, তিনি কি আজ আসবেন না?—কে, বিমল কর? উনি তো অনেকক্ষণ হল এসেছেন। পঙ্কজদা দেখিয়ে দিলেন পার্টিশনের ওপাশের টেবিল। আশ্চর্য। আমার কল্পনার সঙ্গে এতো অমিল! ফর্সা রোগা মতন এক ভদ্রলোক, মাথায় ব্যাকব্রাশ চুল। কালো চশমার মধ্যে দিয়ে বিমল করের চিন্তাশীল চোখ নিবিষ্ট মনে প্রুফ দেখছে।—আমি একটি গল্প দিতে চাই।—শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। দ্বিতীয়বার বলতেই মুখ না তুলে গম্ভীরভাবে বললেন, রেখে যান, পাশের টেবিলে।

—গল্পটা ছাপা হবে কিনা কবে জানতে পারবো?—উনি মুখ না তুলেই এবারেও বললেন, তিন মাস পর।

সেই তিন মাস আমার চোখে ঘুম নেই। হয়ত লেখাটা ছাপা হবে। হয়ত হবে না। এই হয়ত-বাজা মন নিয়েই তিন মাস যেদিন পূর্ণ হল, সেদিন গিয়ে হাজির হলাম। বিমল কর চোখ তুলে দেখলেন, কি চাই? বলতে

হল আমার গল্পের কথা। আমার নাম ধাম। আজকেই সেই তারিখ যেদিন উনি আসতে বলেছিলেন। ওঁর মুখের কাঠিন্যের কোন পরিবর্তন হল না। পিয়নকে ডেকে বললেন, এঁর গল্পটা ফেরৎ দাও।—অক্ষত অবস্থায় ফেরৎ এলো আমার গল্প। আমি সেই মুহূর্তে এগিয়ে দিলাম আর একটা নতুন গল্প। বললাম, এই গল্পের কথা জানতে কবে আসবো?—বিমল কর বললেন, পনেরো দিন পর।

আমার প্রত্যাশার দিনটি এলো পনেরো দিন পর আবার। সেদিন ভীষণ দুর্যোগ। কলকাতার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ছে। যানবাহন প্রায় অচল। সেই ঝড়জলের মধ্যে এক হাঁটু জল ভেঙে আমি গিয়ে পৌঁছুলাম প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটে। আমি সেই প্রথম বিমল করকে হাসতে দেখেছিলাম। উনি বললেন, কি ব্যাপার?—আবারও বলতে হল, আমার আসার উদ্দেশ্য, গল্পের কথা।—মনে পড়লো কিনা জানি না। তবে বিমলদা সহাস্যে চেঁচিয়ে বললেন, সাগরদা, এই মেয়েটি লেখিকা না হয়ে যাবে না দেখছি। এই দিনে? আরে, আমরাই যে পালাই পালাই করছি।—বিমলদার চেয়ারের মুখোমুখি সাগরদার ঘর। সেই সময় সুইংডোর ঠেলে বেরিয়ে আসছিলেন সাগরদা। হাসিমুখে বললেন, তাই নাকি?

সেদিনের জমা দেওয়া গল্পটিই আমার ছাপা হয়েছিল। অবশ্য কয়েক মাস পর। নাম 'লেডিস কম্পার্টমেণ্ট'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাশের দুটি বছরের জীবনে পড়াশুনোটা ছিল আমার কাছে গৌণ ব্যাপার, মুখ্য ব্যাপার ছিল লেখালেখি। দেশ পত্রিকায় এসে দেখছি, একটা বড় জগৎ। আমার প্রিয় অনেক লেখককে আমারই চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। দেখতাম বিখ্যাত সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে। যাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার, স্নেহ আমাকে অভিভূত করতো। যে লেখককে একদিন অত্যন্ত দাম্ভিক মনে হয়েছিল সেই বিমল করকেই দেখলাম তাঁর তরুণ লেখক বন্ধুদের সঙ্গে দারুণ প্রাণখোলাভাবে আড্ডা দিতে। তাঁর স্নেহভরা উদার মন আমাকে মুগ্ধ করল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদিদের নিয়ে তাঁর সেই আড্ডার আসরে আমিও একদিন জায়গা পেয়ে গেলাম। বিমলদা আমায় বলতেন, বালিকা। ওদিকে ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতিরা। আমার মনে হয়েছিল, আমি তো এতদিন ধরে এঁদেরই খুঁজছিলাম। ঠিক এই সময় আর একজন প্রবীণ লেখকের

কাছ থেকেও আমি কম স্নেহ পাইনি। তিনি সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তাঁর স্ত্রী এবং তিনি আমার প্রায় গল্পেরই পাণ্ডুলিপি শুনতেন এবং আমাকে উৎসাহিত করতেন।

আমি লেখার তাগিদেই ছুটে ছুটে যেতাম গোলপার্কের 'সারদাসঙ্ঘ মহিলা নিবাসে'। বিভিন্ন ধরনের মেয়ে। তাদের কত জনের হৃদয়ের কুঠুরীতে কত গোপন কথা। সেই চেনা মহলের ঘরে ঘরে ছিল আমার অবাধ এক্তিয়ার। ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপিকা, শিক্ষিকা, টাইপিস্ট। কতজনের জীবনের কত পরিবর্তনই না দেখতাম। শুধু দেখতাম না একজনের। তিনি প্রতিভাদি। মধ্যবয়স্কা বিধবা, অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ এই মহিলাটি জর্দার কৌটো থেকে জর্দা নিয়ে মুখে পুরতে পুরতে বলতেন, "আমি হলাম গিয়ে বটবৃক্ষ, বুঝলি? আমাকে একইরকমভাবে সব সময় একই ঘরে দেখবি।"

সেই থেকে মেয়েরাই আমার প্রায় গল্পের নায়িকা। তারা কখনো স্ত্রী, কখনো প্রেমিকা, কখনো জননী। তাদের সমস্যাময় জীবন আমার কলমে এসে ভিড় করে। আমি জানি, আমরা মেয়েরা মেয়েদের কথা যেভাবে বলতে পারবো, একজন পুরুষ লেখকের পক্ষে সেভাবে বলা সম্ভব নয়। এখনো আমাদের সমাজ পুরুষ-শাসিত। মেয়েরা আজও লাঞ্ছিত। এই ঘুন ধরা সমাজটার বাইরের খোলসটাই বদলেছে শুধু। মেয়েরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোতে পেরেছে, এইমাত্র। কিন্তু তারা পদে পদে এখনো পরাধীন। ঘরসংসার নিয়ে পড়ে থাকা এমন মেয়ে থেকে চাকুরীজীবী মেয়েরা পর্যন্ত। নারীর মুক্তি, নারীর অধিকার নিয়ে তো অনেক কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু আজকের সমাজ নারীর ওপর অত্যাচার কি বন্ধ করতে পেরেছে? শিক্ষিত, অশিক্ষিত দুই শ্রেণীর মেয়েরাই এখনো ঘরে ঘরে লাঞ্ছিত। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের তো কথাই নেই। সেই নিম্নশ্রেণীর লাঞ্ছিত মেয়েদের প্রতিনিধি কমলী তাই প্রতিবাদে সোচ্চার। পুরুষ জাতটার ওপরে দারুণ ঘেন্না নিয়ে সে রতনকে ফিরিয়ে দেয়। বলে, "তুই যা, আমি খেইটে খাবো। মেয়ে ছাওয়ালের যেতক্ষণ গতর, তেতক্ষণ কদর। (কমলী)

এই মেয়েরাই আবার মায়ের জাত। আমার "মাতৃত্ব" গল্পের মালিনী সেই মেয়েদের প্রতিনিধি। এক বিকৃত মঙ্গোলিয়ান শিশু জন্মানোর পর তাদের স্বামী-স্ত্রীর সুখের সংসারে নেমে আসে অশান্তির ছায়া। তাই দ্বিতীয়বার গর্ভে সন্তান এলে তারা ভয় পায়। পুনরায় একটি বিকৃত শিশুর

ভ্রূণের সম্ভাবনায় নার্সিংহোমে গিয়ে সে অপারেশন করায়। কিন্তু তারপরই মালিনীর মধ্যে জেগে ওঠে মাতৃত্বের হাহাকার,—"একটি অপরিচিত শিশুর কণ্ঠ ভেসে উঠলো যেন, মা, মা, মা। হয়তো সে মঙ্গোলিয়ান বেবি নয়। কিংবা হতেও পারে। মালিনী শুনলো, টুপুসের কান্না। সব শিশুর কান্নাই যে এক।...যে শিশুকে ভ্রূণেই হত্যা করা হল তার একটা অস্পষ্ট অবয়ব তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগলো। ওকে কুরে কুরে খেলো যেন।"

১৯৬১ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাই হ'ল না। সেই পরীক্ষা হল ১৯৬১ সনে। এম-এ পরীক্ষা শেষ হবার অল্পদিনের মধ্যেই আমার বিভিন্ন ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এই সময় আমি বম্বের এক অভিনেত্রীর স্ক্রিপ্‌ট লিখেছিলাম। তিনি আইডিয়া বলতেন, আমি স্ক্রিপ্‌ট তৈরী করতাম। কিন্তু ভদ্রমহিলার অতিরিক্ত মদ্যপান এবং বোতল ছোঁড়াছুড়ির দৃশ্য আমি তিন মাসের বেশী সহ্য করতে পারিনি। ফলে, আমার সেই কাজ অসমাপ্তই থেকে গেল। যদিও ওঁকে আমার খুবই ভাল লেগেছিল। স্ক্রিপ্‌ট লিখতে লিখতে আমি আবিষ্কার করেছিলাম উনি নিজেই একটি বিরাট গল্প। মনে হয়েছিল, এও তো কম লাভ নয়। এক বাংলা স্কুলে এবং এক কনভেণ্টে লিভ ভেকেন্সিতে পড়িয়েছিলাম কিছুদিন। এরপর তিন মাস করেসপনডেনস কলেজে পড়ানো, তারপর জার্নালিস্ট জীবনের দু মাসের অভিজ্ঞতা। সেখানে ছিল কিছু তিক্ততার স্মৃতি। এসব অভিজ্ঞতা আমার কাজে লেগেছে বিভিন্ন লেখার মধ্যে। ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে শুরু হল আমার আর এক অভিজ্ঞতার জীবন। যার নাম দাম্পত্য জীবন। আমার স্বামীর কর্মস্থল তখন ছিল দুর্গাপুরে। আমার লেখার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে কিছুদিন। তবু লিখতে বসেছি মনের তাগিদে। বিশেষ করে আমার স্বামীর অনুপ্রেরণা আমায় জুগিয়েছে লেখার ইন্ধন। আজ সে-ই আমার গল্পের প্রথম শ্রোতা। দুর্গাপুরে লেখার পরিবেশ ছিল। প্রকৃতি ছিল সহায়। বিচিত্র ধরনের মানসিকতা নিয়ে সেখানকার মানুষ আমার লেখার উপকরণ জুগিয়েছে। আমার মনের একান্ত অগোচরে ধীরে ধীরে তারা জমা হয়েছে আমার মনের গভীরে। আমার ছোট্ট ছেলের বায়না এবং সংসারের হাজার চাহিদা মিটিয়ে আমি প্রায়ই লিখতে বসেছি রাত দশটার পর। সামাজিক জীবনকে অস্বীকার করা তো সম্ভব নয়। তাই লোকজনের আসা যাওয়াও তো চলেছে সমানে। আমি লিখছি বলে তো কই তাদের ফিরিয়ে দিতে পারিনি। অথচ শিল্পসাহিত্যের

জগতে যে এই স্বার্থপরতা দরকার। লেখক হতে হলে স্বার্থপর হতেই হবে। একজন পুরুষ লেখকের সঙ্গে একজন মহিলা লেখকের পার্থক্য এখানেই। আমার লেখক সত্তাকে ওখানে প্রায় ভুলে যেতে হতো। মেলামেশার মধ্যে ওখানে ছিল দারুণ রকম কৃত্রিমতা। উচ্চপদস্থ অফিসার স্বামী হলে আর পাঁচজন স্ত্রীকে যেভাবে চলতে হয়, আমাকেও ওভাবেই চলতে হয়েছে। ফলে, এই পাঁচ বছরে আমি ওখানকার তথাকথিত উঁচু সমাজকেই শুধু চিনেছি। ইনডাসট্রিয়াল টাউনের কৃত্রিম মানুষের ভিড়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁদেছে। অনেক রাত্তিরে যখন কলম ধরে বসতাম, তখন মনে হতো লেখা ছাড়া আমার মুক্তি নেই। দুর্গাপুরে আমাদের বাংলোর সামনেই ছিল প্রকাণ্ড শালবন। আমি যখন লিখতে বসতাম, তখন শালবনে রাতজাগা কোন এক ভুতুড়ে পাখি ডাকতো। আমার লেখার নেশা বেড়ে যেতো। চারদিকে ঝিঁঝির ডাক আমার ক্ষণিক সংসারী মনটাকে উদাসীন বাউল করে দিতো। তখন আমার মনে হতো, সাংসারিক জগতের সুখ নামের এক পাখি যে আমায় ভুলিয়ে রাখতে চায়। আমায় বিভ্রান্ত করে। এই সৃষ্টিছাড়া পাখিটা যেন ডেকে ডেকে সেই কথাই বলে। কিন্তু পরদিনই যখন দিনের আলোয় ঝলমল প্রকৃতি, কৃত্রিমতার মধ্যে এই আমি আর-এক আমি হয়ে উঠতো, তখন অনুভব করতাম বুকের কোণে ছোট্ট একটু ব্যথা। মনে হত, আমি কি হারিয়ে ফেলেছি। বুঝতে পারতাম আর কিছু নয়, সময়। আমার সময় হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, সময় হারিয়ে যায়নি। সময় আমায় কিছু দিয়েছে, কিছু মানুষ, কিছু যন্ত্রণা, ভালবাসা, কিছু অভিজ্ঞতা। আজ যা কলমে এসে ভিড় করতে চায় বার বার। পাঁচ বছর পর দুর্গাপুর ছেড়ে আমরা চলে এসেছি কলকাতায়।

ছোটবেলা থেকেই তো লিখছি। যদিও সে লেখা আমার খেয়ালখুশির ফসল। তেমন কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমার শুরুই হয়নি বলতে গেলে। তবু এই সময়ের মধ্যে আমার লেখায় যা আছে, তাই মোটামুটিভাবে বলতে চেষ্টা করছি। আমি লেখায় ব্যঞ্জনা পছন্দ করি। কোন কথাই অবান্তর হবে না, তার মধ্যে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত চাই। আমি পাঠককে কিছুটা ভাবিয়ে রাখতে ভালবাসি। প্রতিটি মুহূর্তের চিত্র এবং ডায়ালগ আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন "তুলির কিছু সময়"-এর শেষ অংশে।—"ও দেখছিল ওর হাতের চুরুটের আগুন। ওর চোখে চোখ রাখলো বারিদ। তুলি একবার

তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। ও বুঝতে পারছিল বারিদের দুর্বলতা। ওর একটা হাতের ওপর বারিদের হাতটা বেশ কাঁপছে। হাত সরিয়ে নিল তুলি। ভাবল, কি লাভ? দেশলাইয়ের বাক্সটা এলোমেলো নাড়তে নাড়তে একটা কাঠি বার করল ও। ফস্ করে ও একটা কাঠি জ্বেলে ফেললো। কাঠিটা পুড়ছে। তুলি তাকিয়ে থাকল। তারপর খানিকটা পুড়ে যাবার পর ও ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল। বারিদ বলল, ভয় পেলি? তুলি বলল, না। বারিদ, বলল, তবে? তুলি বলল, দেখতে ভাল লাগছিল না আগুন।—বারিদ বলল তাই বলে কি আধপোড়া ভাল?—তুলি অন্যমনস্ক। বারিদের চোখ স্থির, গম্ভীর।...বারিদ চলে গেছে। তুলি দরজা বন্ধ করতে এসে ব্যালকনিতে দাঁড়াল। এখনও বৃষ্টি পড়ছে তেমনি। বাইরে বিদঘুটে অন্ধকার। শালবনের মধ্যে দিয়ে হুইসেল বাজিয়ে চলে গেল কোন এক এক্সপ্রেস ট্রেন। ফ্যাক্টরীর আগুন উঠছে দূরের আকাশে। ফসফরাসের মতন কি যেন জ্বলছে। বাতাসে এখনও ভাসছে ভ্যাট সিক্সটি নাইনের সঙ্গে মেশানো অ্যালকাজার চুরুটের গন্ধ। ধোঁয়া। তুলির ভাবতে ভাল লাগছে এই মুহূর্তে বারিদের মুখের গন্ধটা—যদিও সে এখন অনেক দূরে। শুধু তার গামবুটের আওয়াজ আসছে ছপ্ ছপ্ ছপ্।"

আমার চরিত্ররা বড় ভাবে। তাদের আত্মগত বিশ্লেষণ থাকে। আমার অধিকাংশ গল্পেই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে অনেক কথা বলানো থাকে। এজন্যে আমার লেখায় অতীত আসে বার বার। ফ্ল্যাশব্যাকে অথবা নায়ক বা নায়িকার আত্ম-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমি তার পুরনো সময়কে টেনে এনে পাঠকের কাছে তুলে ধরি। "জোনার মন", "রমলাদের বসার ঘরে", "সোনিয়া" ইত্যাদি গল্প তার উদাহরণ। এসব গল্পে বলা হয়েছে, সে অতীতে কি ছিল এবং বর্তমানে কি। শুধু তাই নয়, সময়ের পরিবর্তন তাকে কিভাবে নাড়া দেয়। আমার গল্পের নায়িকার ব্যক্তিত্ববোধ প্রবল। তেমনি প্রবল পরিমিতিবোধ।

"সোনিয়া" গল্পে রূপঙ্কর যখন বলছে, "তুমি আমায় লাইক করো না?—আবেগে কাঁপছিল রূপঙ্করের গলা। যা উঠতি বয়েসের মাদকতায় ভরা। চোখ দুটো আশ্চর্য সুন্দর হয়ে জ্বলছিল। সোনিয়া কেমন ভয় পেয়ে গেল। রূপঙ্করের ওই চোখে ও দেখলো ওর বাবার চোখের প্রতিচ্ছবি। ওর মনে হল, ওর বাবাও কি এই জিজ্ঞাসা করেছিলেন ওর মাকে; আর তাঁর সেই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ওর মা দেউলে হয়ে গিয়েছিলেন?...খুব ঠাণ্ডা গলায় ও বলল, আই ওয়াণ্ট ইউ অনলি অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড।"...

আমি রক্ষণশীল নই। চরিত্র বিশেষে আমি ভাষার ব্যবহার করে থাকি। প্রয়োজনবোধে কোন কথা লিখতেই আমার কলমে বাধে না।

১৯৬১ সনে দীপান্বিতায় "ছেঁড়াপাতা" নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলাম। উপন্যাস না বলে বড় গল্প বলাই ভাল। মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে শেষ করা নিতান্তই ফরমাসী লেখা। তাতে ছিল না তেমন চিন্তার পরিচয়। তবু লেখাটার প্রশংসা করেছিলেন সম্পাদক। দ্বিতীয় খণ্ড লেখার জন্যে উৎসাহিত করেছিলেন। ভেবেছিলাম লিখবো। কিন্তু লেখা হয়নি। ১৯৬২ সনে ভারতে চীনা আক্রমণের পর তেজপুর শহর ভরে গেল মিলিটারিতে। যদিও এই মিলিটারিরা আসতে শুরু করেছিল ১৯৫৯ সনে দালাই লামা এদেশে পালিয়ে আসার পর থেকে। এটা আমাদের স্কুল জীবনের ঘটনা। ওই সৈনিকরাই পরে এসে দাঁড়িয়েছিল আমার গল্পের পাতায়। গণেশঘাটের পাশেই সেই ইউরোপীয়ান ক্লাবে সন্ধ্যেবেলা দেখতাম, তারা নাচত। বোতল গ্লাসের টুং টাং আওয়াজ। তখনো তারা দূরের মানুষ। অনেক দিন পর তাদেরই দেখলাম, নিতান্ত ঘরোয়াভাবেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে। দেখলাম, তাদের অন্তরের সঙ্গে বাইরের ফারাক অনেক। সেই এয়ারফোর্স অফিসারদের মন দেওয়ার খেলা "ছেঁড়াপাতায়"।

কিছুদিন আগে আর একটি উপন্যাস লিখেছি। কোন কারণে অসুবিধে থাকায় ছাপা হয়নি। উপন্যাস লিখতে হলে চাই ধৈর্য, চাই মানসিক প্রস্তুতি। আমার মধ্যে হয়ত খানিকটা ছিল তার অভাব। উপন্যাসের বৃহৎ চিন্তার দিকে মন ঝোঁকেনি তেমন। তবে আজকাল অনুভব করছি, উপন্যাস আমায় লিখতে দেবে। সেখানে আমার স্বাধীনতা অনেক বেশী। আমার ভাবনার পরিধিকে বিস্তৃত করার অবকাশ আছে।

লেখক হিসেবে নিজেকে ভাবতে এখনো আমার সঙ্কোচ হয়। এতদিন যা লিখেছি তা সবই আমার মনের খেয়াল-খুশির ফসল। আমি কি বলতে চাই, সে কথা আমার বলার সময় হয়ত এখনই আসেনি। সত্যি কথা বলতে কি, এখনই শুরু হবে আমার লেখা। আমার লেখক হবার সাধনা। জানি না, আমার দৃষ্টিভঙ্গি আরও বদলাবে কি না। পূর্বতন লেখকদের মধ্যে বিমল কর এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি আমার মানসিক মিল খুঁজে পাই মাঝে মাঝে।

তবু বলি, আমি যে কথা লিখি, তা আমার একান্তই ব্যক্তিগত অনুভূতিরই

কথা। প্রত্যেক লেখকই তাঁর স্বকীয়তার ছাপ রাখেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে, ভাষার মধ্যে, বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে। আমায় যখন লেখক হিসেবে ধরা হচ্ছে, তাহলে বলি, আমার লেখা পড়ে পাঠক যদি তৃপ্ত হন খুশি হই। তবে পাঠককে খুশি রাখতে গিয়ে আমি কখনই আমার বক্তব্য থেকে সরে যাবো না। আমি যা বলতে চাই তা আমায় বলতেই হবে। না বলে আমার উপায় নেই। সাহিত্য আমার জীবন, আমার স্বপ্ন, আমার দুঃখের ভালবাসা।

কণা বসুমিশ্র

তুলির কিছু সময়

ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সেই বৃষ্টির মধ্যেই ও বেরিয়ে গেল।

তুলি প্রথমে বুঝতে পারেনি। ও যখন ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল, তুলি ভাবল ও বোধ হয় বসার ঘরে গেল কাগজ-টাগজ পড়তে। সাধারণত রাগ-টাগ হলে ও যা করে থাকে। তাই তুলি যেমন চুল আঁচড়াচ্ছিল, তেমনিই আঁচড়াতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই ও শুনল গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করার শব্দ। তুলি অবাক হল। ও কান পাতল। ভাবল, যাক্‌গে, যে যায় তাকে যেতে দেওয়াই ভাল। মেজাজ ভাল হলে ঠিকই ফিরে আসবে। এখন ওকে বাধা দেওয়া মানে নিজেকে খেলো করা। তবু গাড়ির স্টার্টটা যখন আরো জোর হল, ও আর পারল না চুপচাপ বসে থাকতে। খাটে ঘুমুচ্ছিল টুনটুন। ওকে ফেলে রেখেই তুলি হনহন করে নেমে গেল নীচে।

গাড়িটা তখন বাগানের লাল সুরকির পথটা ধরে এগোচ্ছে। মরিয়া হয়ে তুলি ছুটল। নিলয় গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ও ছুটে গিয়ে চেপে ধরল স্টিয়ারিং। কোন লাভই হল না। জোরে এক্সিলারেটার চেপে বেরিয়ে গেল নিলয়।

গেটটা ধরে কাঠের মতন দাঁড়িয়ে থাকল তুলি। ও ভাবছে, নিলয় গেল কোথায়? হয়ত ক্লাবের বারটাতে গিয়েই ঢুকেছে। আজকাল তো আবার নেশার বাতিক হয়েছে সাহেবের। কেন যেন তুলির চোখ দিয়ে একটু জল বেরিয়ে এল।

এই রাত্তিরেও একেবারে ভিজে স্নান করে উঠেছে ও। গেটের মাথায় মাধবীলতার ঝাড় থেকে অনবরত জল পড়ছে। টপ্‌টপ্‌

করে জল পড়ছে ওর এলো চুল বেয়ে। খুব বিশ্রীভাবে ভিজছে ও। ওর কাপড়-চোপড় টানটান ভাবে সেঁটে রয়েছে শরীরের সঙ্গে। ঠিক এই অবস্থায় কেউ দেখলে ওকে নিশ্চয় পাগল বলবে। তুলি আড়চোখে একবার দেখে নিল ওপাশের বাড়িটা। না, কেউ দেখছে না তাকে। শুধু ও-বাড়ির মালী কালভার্টের এক কোণে বসে ভিজছে তারই মত। তুলির খুব শীত করছিল। ও ভিজে কাপড়ের জল নিংড়োতে নিংড়োতে ঘরে ঢুকল।

কাপড়-চোপড় ছেড়ে ও ভাবল, ক্লাবে কি একটা ফোন করে দেখবে? অস্থির একটা জেদী মেয়ের মত ও ফোনের ডায়াল ঘুরোতে লাগল। পেয়ে গেল নম্বরটা। ওপাশ থেকে যখন বলল, হ্যালো!—ও তখন ফোন ছেড়ে দিল। ভাল লাগল না কথা বলতে আর।

তুলি ভাবল, এখন ও কি করবে? কিছু ভাল লাগছে না কিস্যু না।

খুব ঘুমুচ্ছে টুনটুন। ওর ছোট্ট বুকটায় নিঃশ্বাসের ওঠা-নামা অনেকক্ষণ ধরে দেখল তুলি। তারপর ও মুখটাকে কাছে এনে টুনটুনের নরম গালে আলতো করে একটা চুমু খেল। বেশ লাগল ওর, টুনটুনের গায়ের বমি মেশানো বেবী পাউডারের গন্ধটা।

সারা দিনের চটকানো বিছানাটা চোখে পড়ল হঠাৎ। ও বিছানা ঝাড়লো। ধোপভাঙা একটা চাদর পাতলো। তার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে ও সটান শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। চোখে পড়ে গেল টেবিলের ওপরে খোলা একখানা নিষিদ্ধ বই। যার ওপরে নির্লজ্জের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে রোমের এক ব্যভিচারিণী রানী। যিনি এক রাতে চল্লিশজন পুরুষকে সঙ্গদান করেও ক্লান্ত হতেন না। ও আর তাকাতে পারল না ওই কামার্ত, উলঙ্গ ছবিটার দিকে। ছবিটা যেন আজ দুপুরে নিলয়ের সামনে দাঁড়ান তারই মডেল। তুলির চোখ জ্বালা করে উঠল। ও বিছানার তলায় সরিয়ে রাখল বইটা।

ওর মনে হল, দুর্বল মুহূর্তে মানুষ কত সস্তা হতে পারে। দুপুরে তো ওই বইখানার ছবি দেখতে তার খারাপ লাগেনি। অথচ এখন লাগছে। পাগলের মতন চুমু খেতে খেতে নিলয় যখন বলেছিল, আমায় খুশি করে দাও, প্লিজ···। তখন ওর কথাগুলো ওর রক্তের মধ্যে যেন নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। স্বামীর বুকের মধ্যে পিষে যেতে যেতে শরীরের সবটুকু উত্তাপ দিয়ে ও তো ওকে খুশিই করে দিয়েছিল। কিন্তু বড় অল্প সময়ের সেই মুহূর্ত। নইলে নিলয়ের মন এমন করে বদলে গেল কেন? তুলিও তো মরছে অনুশোচনায়। যদিও অনেক রাতে ঘরে এলে নিলয় আবার বদলাবে। ওকে উত্তেজিত করার জন্য আবার কাছে টানবে। আর তুলি যদি তাতে সাড়া না দেয়, তা হলে ও বলবে, তুমি একটা ফ্রিজ।—ওর কাঙাল চোখ দুটো তুলিকে সব ভুলিয়ে দেবে।

কিন্তু কেন? তুলি ভাবলো, সে কি দম-দেওয়া স্প্রীংয়ের পুতুল যে, নিলয় ওকে যেমন ইচ্ছে তেমনি করে নাচাবে?···

খেলার রীলে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল ওরা। ঘুম ভাঙলে নিলয় বলল, চল, সেন সাহেবের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। সেদিন ওরা ঘুরে গেল।

তুলি তখন দুধের বোতল ধরে রয়েছে টুনটুনের মুখে। পাশে টিপয়ের ওপর ঠাণ্ডা হচ্ছে ওর চায়ের কাপ। ও একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, এই বৃষ্টিতে?

নিলয় বলল, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাব, বৃষ্টিতে কি আসে যায়?

তুলির বেরোতে তখন একেবারেই ইচ্ছে-টিচ্ছে করছিল না। ও বলল, ভাল লাগছে না এখন কারো বাড়িতে যেতে।

নিলয় বলল, কিন্তু রিটার্ন ভিজিটের প্রশ্ন রয়েছে না!

হাসল তুলি। বলল, মেসিনের মতন অতো নিয়মমাফিক

চলা আমার ভাল লাগে না। ওরা এসেছে বলেই যে আমাদের···

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে নিলয় বলল, চটপট তৈরি হয়ে নাও।

যদি না হই? –ভুরু বেঁকিয়ে তুলি বলল, ওরা এসেছে বলেই যে···

নিলয় বলল, আহ্, তুমি কি তৈরি হবে?

তুলি বলল, না, ওরা এসেছে বলেই যে আমাদের যেতে হবে তার কোন মানে নেই। তার চেয়ে চল ব্যারেজ ঘুরে আসি।

নিলয় গুম হয়ে থাকল। কিছু বলল না।

তুলি বাচ্চাদের মতন আদুরে গলায় বলল, জানলে গো, অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে না আমি জলের ডাক শুনতে পাই।

বিরক্তির সঙ্গে নিলয় সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল। তেতো গলায় বলল, তোমার শুধু ব্যারেজ আর ব্যারেজ। কী যে মধু আছে সেখানে! যত্তসব একঘেয়ে ব্যাপার।

তুলি মুচকি একটু হাসল। বলল, একঘেয়ে শব্দটা কিন্তু রিলেটিভ, না গো? আমার যেমন একঘেয়ে লাগে তোমার ওই রিটার্ন ভিজিট জাতীয় কথাগুলো শুনলে।

সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে নিলয় বলল, দিলে তো মেজাজটা খারাপ করে?

হাসল তুলি। বলল, তোমার মেজাজ যে কিসে খারাপ হয়, আর কিসে হয় না, তা আমি আজও বুঝলুম না।

চটে গিয়ে নিলয় বলল, এই পাঁচ বছর ধরেও বুঝলে না?— আমি আধ ঘণ্টা সময় দিলুম, এর মধ্যে তোমায় তৈরি হতে হবে।

জুলুম করছ? বলল তুলি।

নিলয় বলল, আলবৎ।

আর তুলি ঠাণ্ডা গলায় তক্ষুনি বলল, আমি যাব না।—

হাতের সিগারেটটা নাচাতে নাচাতে নিলয় বলল, যাবে না!

মানে? আমি দেখতে চাই তোমার ইচ্ছের দাম কতটুকু!—বেরিয়ে গেল নিলয়।

কাচের জানলায় বৃষ্টির জলকণাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তুলির কান্না পেয়ে গেল। ও ভাবল, নিলয় বড় নিষ্ঠুর। ওর জন্যে কি একটা সন্ধ্যেও খরচ করতে পারত না? রোজই তো থাকে সেই ফ্যাক্টরি। ফ্যাকটরির পরে ক্লাব, নইলে পার্টি অথবা কারো বাড়িতে গিয়ে আড্ডা! আড্ডায়ও তো সেই মাপজোক কথা, সেই র‍্যাঙ্ক, পজিসন, স্ট্যাটাসের প্রশ্ন মেপে চলা। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, নিলয় একদিন ছবি আঁকত, বই পড়তে ভালবাসত।

কোথায় গেল ওর সেই শিল্পীর মন? আসলে,—তুলি ভাবল, মানুষের মেলামেশা, চলাফেরার মধ্যে যখনই সীমিত ভাব এসে পড়ে, তখনই সে হারিয়ে যায় তার বড় জগৎ থেকে। তুলি আরও কত কি ভাবতে লাগল হিজিবিজি।

তুলি ভাবল, এই শিল্পনগরীর আমরা প্রত্যেকে যেন রবীন্দ্রনাথের যক্ষপুরীর একেকজন মানুষ, যাদের পরিচয় নামে নয়, নম্বরে। এখানে কে ভাল ছবি আঁকে, কে ভাল গান গায়, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কে কোন কোয়ার্টারে বাস করে, কার কত মাইনে তা দিয়েই হয় সবার পরিচয়। তুলি অবশ্য আশা করেনি, এই বৃষ্টির সন্ধ্যায় নিলয় তাকে ঘরে বসে ক্ষ্যাপার মতন কবিতা শোনাবে। তুলি এও আশা করেনি, আজ সন্ধ্যায় সাধারণ শ্রমিকদের পাড়ায় যে গানের জলসা হচ্ছে, সেখানে নিলয় তাকে নিয়ে যাবে।

বরং অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই আজ ও পেয়েছিল। আজ সকাল থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত নিলয় শুধু তারই কাছে-কাছে ছিল। সব ছুটির দিনে তো আর পাওয়া যায় না তাকে। ঘন ঘন ফোন আসে সকাল থেকে।

হয়ত ফ্যাক্টরির সবচেয়ে বড় কত্তার পি-এ তাকে ডেকে বলেন,

গেস্ট হাউসে মিটিং আছে, আসুন। নয়ত রোটারী ক্লাবের মিটিং থাকে, নইলে ছুটতে হয় অন্য কোন বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে। কিন্তু আজ সে-ধরনের কোন ব্যাপার-ট্যাপার না ঘটায়, নিরিবিলিতে ছিল দু'জনে।

সকালে খেয়াল-খুশি মতন রেকর্ড বাজাল ওরা, নাচলো, গাইল, দু'জনের হাসি, ঠাট্টা, কথার টেপ করল দু'জনে। তারপর মনের আবেগে টুনটুনকে বুকে চেপে ধরে নিলয় উল্লাসে ফেটে পড়ল।

টুনটুন ডাকলো, দা-দা-দা। হা-হা করে হাসল নিলয়। বলল, বল্, বল্, আমি তো এককালে তোর মায়ের দাদাই ছিলুম রে।

তুলি হেসে ফেলল। বলল, আমি এখনও তোমায় মাঝে মাঝে দাদা বলে ফেলি, জানলে ?—

ওকে জাপটে ধরে নিলয় বলেছিল, তোমার দাদাদের মধ্যে আমি ক' নম্বর ?

বিজ্ঞের মতন হাসল টুনটুন। হেসে ফেলল ওরাও।

তারপর লনে চেয়ার পেতে রোদে পিঠ দিয়ে ওরা শুনতে বসেছিল খেলার রীলে। উত্তেজনার মাথায় ট্রানজিসটার ভেঙে ফেলে আর কি! ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের এই দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে নিলয় ছিল ইংলণ্ডের পক্ষে, আর তুলি ভারতের। একজন গ্রীগ, ডেনেস, কট্রামের ভক্ত। অন্যজন চন্দ্রশেখর, বেদী, ওয়াড়েকরদের। রীলে শুনতে শুনতে দু'জনের প্রায় হাতাহাতি হবার মতন অবস্থা।

পাখির মতন হালকা লাগছিল আজ তুলির সারাটা দিন। সেই নতুন বিয়ের পর যেমন লাগত, যখন নিলয়কে ছোঁয়া যেত সাধারণ মানুষের মতো। ফ্যাক্টরির সবচেয়ে উঁচু কর্তার কাছাকাছি যখন সে পৌঁছোয়নি।

এই মুহূর্তে তুলি যেন ক্লান্ত, বিষণ্ন। বন্ধ শার্সির মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামনের নির্জন রাস্তাটা। কালো সাপের মত ফণা তুলে নাচছে নীচের রাস্তায় জলের স্রোত। তুলি ভাবছে,

সুখ শব্দটা বড় কঠিন। একজনকে সুখী করতে হলে নিজেকে যে কতখানি ছাড়তে হয়! ছাড়তে ছাড়তে এমন হয় যে, নিজের আর কিছুই থাকে না। নাইবা থাকলো। কিন্তু বেপরোয়া মনটা যদি হঠাৎ কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে, সেটা কি দোষের? ওর কথা মতন চলতে চলতে ও যেন ওর হাতের তৈরি একটা পুতুল হয়ে গিয়েছে। সেই পুতুল গড়ার আনন্দ নিলয় কতটা পেয়েছে ও জানে না। তুলি শুধু নিজের কথাই বলতে পারে। ও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে নিজেকে একটা মমি মনে করছে।

বাইরে এখন ভীষণ অন্ধকার। ব্যাঙ ডাকছে, আর কোন এক ভূতুড়ে পাখির ডাক শিরিষ গাছের মাথায়। তুলি ভাবছে, সব থেকে ভাল হয় যে যার ইচ্ছে মতন চললে।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটা জিপসী মেয়ে। পরনে ঘাগরা, মাথায় ওড়না। কোমর দুলিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। ও প্রায়ই যায় এখান দিয়ে। বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও তাঁবু ফেলেছে। ওরা যাযাবর। ভাবতে বেশ লাগে তুলির। ওকে ডেকে কি একটু কথা বলবে তুলি? না, থাক। নিলয় হয়ত পছন্দ করবে না। কিন্তু কতদিন আর এই বাধা-নিষেধের মধ্যে হোঁচট খাবে ও?

হাওয়ার দাপট চলছে শালের বনে। বিদ্যুতের আলোয় চোখে পড়ছে তার মধ্যে আঁকাবাঁকা সরু পথ। দুপুরে ওখানে কোকিল ডাকে, ডাহুকও। আর দোয়েল যা শিস দেয় না? দারুণ। ওকে যেন জ্বালাতন করে রীতিমতন। তখন তুলির ইচ্ছে করে, ওখান দিয়ে একবার হাঁটতে।

এ সব ইচ্ছের কথা নিলয়কে বললে, ও খুব হাসে। নিলয় বলে, তুমি একটা পাগল। ও ওকে মনে করিয়ে দেয়, ও সাহেবপাড়ার বউ, ওসব বেয়াড়া ইচ্ছে ওকে মানায় না। বরং তার চেয়ে ক্লাবে-টাবে গিয়ে ও যদি নাচে, গান-টান গায়, সেটা ওকে অনেক বেশী মানায়।

লাইট পোস্টের ভূতুড়ে আলোয় মনে হচ্ছে কে যেন আসছে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা লোকটির। মাথায় টুপি, গায়ে বর্ষাতি। তার রবারের গামবুটের মধ্যে জল ঢুকে আওয়াজ হচ্ছে ছপ্, ছপ্, ছপ্।

তুলি অবাক হয়ে দেখল, ওদেরই গেট খুলল লোকটা। ওর ভয়-ভয় করল। অচেনা কোন বাজে লোক নয়তো?—ভাবল তুলি, যা এই শহরে হামেশাই ঘটে থাকে।

এক সময় বেল বাজল দরজায়। তুলি বলল, কে? কোন সাড়া নেই। আবার বাজল বেল। তুলি আবারও বলল, কে? তার উত্তরে বেলটাই বাজল শুধু।

তুলি প্রথমে ভাবল, মোহনকে ডাকবে। আবার ভাবল, না থাক। ও দরজার গায়ে লাগানো আই দিয়ে দেখল।

ও আশ্চর্য হল বারিদকে দেখে। ওর ছোটবেলার বন্ধু। এখানেই কোন একটা ফ্যাকটরিতে কাজ করে, ফোরম্যান না কি যেন। ওকে দেখলে অনেক দিনের অনেক কথা মনে পড়ে যায় তুলির—সেই লেকের জলে সাঁতার কাটা, গাছের ডালে বসে পাখির বাসা পাড়া।

হাসতে হাসতে দরজা খুলল তুলি। বলল, মারবো এক চাঁটি, অসভ্য কোথাকার।

বারিদ বলল, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম তো। তারপর বলল, দাঁড়া, তোর কত্তাকে বলব, যাকে-তাকে তুই দরজা খুলে দিস।

তুলি ঠোঁট উলটে বলল, বলিস। আমার কত্তার মন অত ছোট নয়।

হা-হা করে হাসল বারিদ। হঠাৎই যেন ওর চোখে পড়ে গেল টুনটুনের ঘুমন্ত মুখটা। বারিদ বলল, বাহ্, তোর মেয়ে তো ফার্স্ট কেলাস হয়েছে রে।—ঠিক আমার মত তাই না? তুলির ঠোঁটে কৌতুক।

বারিদ বলল, তোকে টেক্কা দেবে। ও হিন্দী ছবির হিরোইন হবে।

কৃত্রিম রাগে তুলি বলল, ইস্ কী আমার উদাহরণ!

বারিদ টুনটুনের গালে একটা টোকা মেরে বলল, আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, তোর মেয়ে ডেসডিমনা, হল তো?

ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিল তুলি। বর্ষাতির ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ওর হাঁটুতে কাদা, মুখেও কোথাও কোথাও লেগে রয়েছে কাদার ছোপ। তুলি বলল, এবার তোর ধরাচুড়ো খোল তো। তোর গায়ে এত কাদা লাগল কি করে?

রবারের গামবুট, মাথার টুপি খুলতে খুলতে বারিদ বলল, আজ আমাদের ম্যাচ ছিল, ওই তো কল্পতরুর মাঠে। যা একখানা গোল দিয়েছি না, দারুণ।

তুলি বলল, এই বিষ্টিতেও খেলতে বেরিয়েছিস্? তোর শখ বলিহারী। তারপর আবার ফুটবল! আমি তো জানতাম, এই শীতে মানুষ ক্রিকেট খেলে।

বারিদ বলল, দুঃখে খেলছি, ইণ্ডিয়া যেভাবে হারতে চলেছে।

তুলি অন্যমনস্কভাবে বলল, হুঁ।

দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র একশো একান্ন রান তুলেই সব ক'টা গেল!

তুলি বলল, তা তুই এ সময় এখানে? আমি তো ভেবেছিলুম, তুই এ সময় কলকাতায় থাকবি খেলার মাঠে।

বারিদ সেকথা কানে না-তুলে বলল, ইংল্যাণ্ডের টনি গ্রেগ-ফেগের মারের তুলনা নেই, আজ তো চার উইকেটে ওদের একশো পাঁচ হয়ে রয়েছে। ইণ্ডিয়া হারবেই।

তুলি বলল, বলা যায় না, ক্রিকেটের ব্যাপার তো।

বারিদ হাসল। বলল, যাক, তোর সাহেব কোথায়? তিনি কি কলকাতায় খেলার মাঠে লাইন দিচ্ছেন?

তুলি বলল, উহুঁ এখানেই। তবে কোথায় গেছে কে জানে?

সে কি! ভুরু কোঁচকাল বারিদ। বলল, বড্ড বেরসিক লোক তো। এই বাদলার রাতে বউ ফেলে কেউ পালায়?

তুলি অ্যাশট্রের ছাই ফেলে এসে বলল, হ্যাঁ, ঠিক তোর মত।

বারিদ হেসে বলল, আমার বউ? তিনি এখন কলকাতায় পিত্রালয়ে। রীতিমতন আড্ডা দিচ্ছেন কফি হাউস কিংবা বসন্ত কেবিনে।

বাহ্, চমৎকার। তোর কপাল পুড়েছে তো? তুলি রসিকতা করল।

বারিদ হাসল না। বলল, একটা ভালো চাকরী-বাকরী না হলে আর চলছে না। ফ্রিজ, গাড়ি, স্কুটার না হলে বউ ঘরে থাকবে না!

নরম চোখে তাকাল তুলি। বলল, কি আমার পুরুষ মানুষ রে! বউকে বাগে আনার ক্ষমতা নেই।

হুঁ, হুঁ, অনেকেরই নেই। যেমন নেই চ্যাটার্জী সাহেবের। মুচকি মুচকি হাসছিল বারিদ।

একটু সময় তাকিয়ে থাকল তুলি ওর দিকে। তারপর বলল, থাম্, যে ঘর করে সে বোঝে।

বারিদ এবার গম্ভীর হল। ও ঘরময় পায়চারি করছে। ওর এক হাত ঢোকানো প্যান্টের পকেটে। ও বলল, মেয়েরা স্রেফ চায় টাকা, বুঝলি?

যা, যা, হয়েছে। ক'টা মেয়ের সম্বন্ধে তোর অভিজ্ঞতা আছে রে?—তুলি জ্বলে উঠল।

বারিদ জ্বলল না। ও হাসতে হাসতে বলল, আপাতত আমার সামনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কথাই বলতে পারি।

তুলি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ওহ্।

বারিদ বলল, তোর মনে আছে তো, ছেলেবেলায় তোর পুতুল-বিয়ের সময় তুই আমায় কর্তা বানিয়েছিলি আর তারপর আমাদের

দু'জনের একদিন বিয়ে হল খেলাঘরে!

বারিদের গোঁফের ফাঁকে হাসি, গলার স্বর কৃত্রিম গাঢ়।

তুলি হয়ত কিছু বলত। কিন্তু ওর চোখ দুটো ঘুরে গেল দরজায়। ও ঘরে টেলিফোন বাজছে। ও মোহন, মোহন, বলে চেঁচাল। কোন সাড়া পাওয়া গেল না মোহনের।

বারিদ বলল, নিজেই যা না, তোর কত্তা বোধ হয় ডাকছে।

তুলি এগিয়ে এল ফোনের কাছে। সারাদিন এমনি অসংখ্য ফোন আসে নিলয়ের। স্বামী ভি আই পি হলে যা হয়। এদিকে স্ত্রীর প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি। ও রিসেপসনিস্ট মেয়েদের মত মুখে হাসি টেনে ফোন ধরে বলল, হ্যালো। থ্রী টু ফাইভ সেভেন।

—কে, তুলি?

—অজন্তা নাকি?

—হুঁ।

—কি করছো?

তুলি বলল, এই তো মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে এলুম।

—কেন, তোমার আয়া?—অজন্তা বলল।

তুলি বলল, নেই, চলে গেছে।

—সে কি!—অজন্তা বলল, তুমি চালাচ্ছো কি করে? আমি হলে তো হিমসিম খেয়ে মরতুম। এই ছাখো না, আমার তো এখন তিনটে লোক, তাও আমার চলছে না।

অজন্তা বলল, সব থেকে ভাল হয় কি জানো? হ্যালো, হ্যালো, তুলি।

তুলি বলল, বল, আমি শুনছি।

অজন্তা বলল, আমাদের ফোনের ভেতরে বেশ গণ্ডগোল হচ্ছে। সবচেয়ে ভাল হয় কি জানো? কলকাতা থেকে একজন আয়া আনিয়ে নাও।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বসে পড়ল তুলি। বলল, ভাবছি,

তাই করবো।

তারপর আর কি খবর বল ?—অজন্তা বলল।

পা দোলাতে দোলাতে তুলি বলল, এই চলে যাচ্ছে এক রকম।

অজন্তা বলল, আজকেব খেলার রেজাল্ট জানো তো ?

তুলি বলল, খুব বাজে খেলেছে ইণ্ডিয়া।

অজন্তা বলল, যা বলেছ। আমাব কত্তা তো আবার ওখানেই পড়ে রয়েছে। পঁয়তাল্লিশ টাকার টিকিট ব্ল্যাকে কিনেছে তিন শো টাকা দিয়ে।—

খুক্ খুক্ করে সামান্য হাসল তুলি।

অজন্তা বলল, এই, আমরা গাড়ি বিক্রী করছি।

তুলি বলল, কেন ?

অজন্তা বলল, বড় কিনবো ভাবছি। এই ছোটতে আর চলছে না, এত ছোট।

হাসল তুলি। ওদেরও ছোট। বুঝল, অজন্তা খুব ডাঁট নিচ্ছে।

তুলি বলল, আমার আবার ছোট গাড়ি দারুণ লাগে।

অজন্তা বলল, আরে দূর, বড়োর কাছে কোন গাড়ি দাঁড়ায় ?

বসে থাকতে থাকতে শুয়ে পড়ল তুলি। এত বকতে পারে অজন্তা। ওর বিরক্তি লাগছে। ও বলল, এই, আজ রাখছি, কেমন !

অজন্তা বলল, কেন, এত তাড়া কিসের ? শোনো, শোনো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা রয়েছে।

তুলি বলল, বল ?

এই সামনের ছুটিতে আমরা কাশ্মীর যাব ভাবছি, বাই কার।

তুলি জোরে হেসে ফেলল, পুজোর ছুটি ? তার তো এখনও এক বছর দেরী।

অজন্তা অপ্রস্তুতের হাসি হাসলো। বলল, বাই দি বাই, আচ্ছা, তুলি, রোববার ক্লাবে যাওনি কেন ? জোর জমেছিল পার্টি। মানে

বোতলের ব্যাপার-ট্যাপারগুলো টপ হয়েছিল আর কি। আর আমি যা একখানা মাঞ্জা দিয়েছিলুম না? আগুন!

তুলি বলল, ইস্, খুব মিস করেছি তা হলে। আচ্ছা, এখন রাখছি, পরে কথা বলব। টুনটুনকে নীচে একলা রেখে এসেছি।

অজন্তা বলল, ওরে ব্বাস্, একলা রেখে এসেছ? কেন, তোমার মোহন কোথায়?

তুলি নির্বিকারভাবে বলল, কে জানে, বোধ হয় ঘুমুচ্ছে।

সে কি! অজন্তা বলল, তুমি এ সব টলারেট কর?

তুলি বলল, সব সময় করি না।

অজন্তা বলল, তার মানে মাঝে মাঝে কর! যাক্, সেদিন পার্টিতে গেলে না কেন?

হাই তুলল তুলি। বলল, এমনি, ভাল্ লাগল না যেতে।

অজন্তা বলল, ভাল না লাগলেও যেতে হয়। হাসব্যাণ্ডকে সব সময় একা ছাড়তে নেই। অনেক সময় গার্ড দিতে হয়। চাপা হাসির আওয়াজ উঠল অজন্তার গলায়।

তুলি সন্দেহজনকভাবে তাকাল ছাদের সিলিংয়ের দিকে। তারপর বলল, কেন, আত্মবিশ্বাস কি আমি হারিয়ে ফেলেছি?

অজন্তা যেন প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, অতটা কনফিডেন্স থাকা ভাল নয়।

অনেকদিন আগে বাগানে একটা সাপ দেখেছিল তুলি, তার হিস্ হিস্ আওয়াজের কথা ওর মনে পড়ে গেল। তুলি রুক্ষ গলায় বলল, আমাদের ফোনের ভেতর বিশ্রী একটা আওয়াজ হচ্ছে, আমি রাখছি।

অজন্তা বলল, হ্যালো তুলি, জাস্ট এ মিনিট প্লিজ। তোমার কত্তাকে সেদিন আমরা যা নেশা করিয়েছিলুম না, হুইস্কির মধ্যে চিনি মিশিয়ে!

কিছু না জেনেও তুলি বলল, জানি।

অজন্তা চেপে চেপে বলল, তারপর তোমার মিস্টার তো বাড়ি ফিরতেই চান না। আমরা জোর করে···হা···হা···হা।

তুলির ধৈর্য হারিয়ে যাচ্ছিল। ও বলল, বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছ তো?

মানে, অজন্তা বলল, উনি যা কাণ্ড করছিলেন মিসেস রাউতের হাত ধরে—হা···হা···উনিও খুব টেনেছিলেন কি না! অজন্তা টেনে টেনে হাসতে লাগল।

তুলি অধৈর্যের মতন রিসিভারটা ঝাঁকিয়ে বলল, হাত ধরে নেচেছিল তো?

শুধু তাই নয়—অজন্তা তখনও হাসছে। বলল, ওঁকে জড়িয়ে ধরে···।

ওর কথা কেড়ে নিয়ে তুলি বলল, কিস্ করেছিল?

মাই গুডনেস।—অজন্তা বলল, তুমি জানলে কি করে?

যদিও তুলি হাসছে, তবুও বুকের মধ্যে কাটা মাছের ছটফটানি টের পাচ্ছিল তুলি।

তুলি স্বাভাবিকভাবেই বলতে চেষ্টা করল, মিস্টার চ্যাটার্জীর এমন কোন সিক্রেট ব্যাপার নেই, যা তার স্ত্রীর অজানা।

একটু যেন থমকে গেল অজন্তা। বলল, তুমি কি কিছু মাইণ্ড করলে?

তুলি বলল, আরে না না, বন্ধুর বউদের সঙ্গে ও যদি একটু ঠাট্টা তামাসা করেই থাকে, তা নিয়ে অত মাইণ্ড করার কি আছে? আর এ-সবের তো চলই রয়েছে আজকাল! টুনটুন কাঁদছে, আচ্ছা, আজ রাখছি, কেমন?

ওকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তুলি ঝপ্ করে রেখে দিল ফোনটা। কিছুক্ষণ দম মেরে বসে রইল তুলি। তারপর সব ব্যাপারটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইল।

ও খুব স্বাভাবিকভাবে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনল, বারিদ

গাইছে, ও ডিয়ার, সাচে সাচ আই লাভ ইউ ভেরী মাচ, ভেরী মাচ, ভেরী মাচ।

ঘরে ঢুকে তুলি দেখল, বারিদ টুনটুনকে পিঠে নিয়ে সারা ঘরে ঘোড়া হয়ে ঘুরছে। দৃশ্যটা খুব উপভোগ্য। কিন্তু তুলি অন্যমনস্ক। অজন্তার কথার ধাক্কা তখনো এসে বাজছে ওর বুকে। মিসেস রাউত, অজন্তা, নিলয়, এরা সবাই তালগোল পাকিয়ে বিশ্রী একটা যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে।

তবুও যন্ত্রের মতন হাসল তুলি। বলল, শেষ পর্যন্ত তুই আমারই মেয়ের প্রেমে পড়লি?

ব্যঙ্গের সুরে বারিদ বলল, হ্যাঁ, বিলেতে তো শাশুড়ির প্রেমেও পড়ার রেওয়াজ রয়েছে। তারপর ম্যাডামের কথা শেষ হল? তুই কার সঙ্গে অত কথা বলছিলি রে?

তুলি বলল, তা দিয়ে তোর দরকার?

বারিদ হাসল। বলল, একটু কফি-টফি কি চলবে? শুধু-মুখেই কেটে পড়তে হবে?

তুলি মোহনকে ডাকতে যাচ্ছিল। বারিদ বলল, আবার মোহন কেন? বেগমসাহেবার চিনি, দুধ সব কোথায় জানলে আমিই করে খাওয়াচ্ছি। ঘরে কবি স্ত্রীর পদসেবা, আর এখানে···

তুলি এমন চাউনি ছুঁড়ল যে বারিদের আর কথা শেষ হল না।

কফি করতে করতে তুলি ভাবছে, ও নিজেকে খেলো করেনি তো অজন্তার কাছে? অজন্তা যদি আবার কখনও আসে ও-সব বলতে?

বারিদ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কোকিলের ডাক ডাকল। তুলির ঠোঁটে অল্প অল্প হাসি। বারিদ গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকল, ও ডিয়ার সাচে সাচ···।

তুলি বলল, বাংলা গান কি ভুলে গেছিস?

বারিদ বলল, তবু তো চুল বাবরি করিই নি।

তা ওটাই বা বাকি থাকে কেন ?—বলল তুলি।

বারিদ বলল, তোর মেয়ে বড় হলে রাখবো।

তুলি হাসল। ও তাকাল মেয়ের দিকে। দেখল, বারিদের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে টুনটুন। নীচেই ছিল উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা টুনটুনের ছোট খাটটা। ওখানে ওকে শুইয়ে দিল তুলি।

বারিদ ছেলেমানুষের মতন বলল, আচ্ছা, তোর মেয়ে বড় হলে আমায় কি বলবে বল তো !

মামা ?—তুলি হাসল।

বারিদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, হায়, প্রেয়সীর শিশু মোরে মামা বলে ডাকে। বাবা বলার কথা ছিল যাকে।

যাহ্, ফাজিল! ওর পিঠে একটা চড় মেরে হাসল তুলি। বলল, তুই এখনো ঠিক তেমনি রয়েছিস্ !

বারিদের তখন আর উত্তর দেবার সময় নেই। স্যাণ্ডউইচে কামড় দিচ্ছে তখন।

তুলির বেশ লাগছে ওকে। ও যেন বার বার ফিরে যাচ্ছে ওর সেই ছেলেবেলার দিনে! বারিদ এলেই এমন হয়। তুলি যেন একেবারে বদলে যায়। ছেলেমানুষী করার সুযোগ তো আর সবার সঙ্গে হয় না।

তুলির মনে হয়, ওর সেই তাজা নরম ঘাসের মতন সবুজ মনটা আজও মরেনি। বারিদ সেই মনটাকেই টেনে এনে খেলনার মতন দোলায়।

বারিদ বলল, বেগমসাহেবা হঠাৎ চুপচাপ ?

তুলি বলল, তোর বেগমসাহেবা নামটা আমার এত বাজে লাগে !

বারিদ বলল, তবে মেমসাহেব বলি ?

তুলি আবার অন্যমনস্ক। ও ভাবছে, নিলয় এখনও আসছে না কেন ? ও কি সত্যি সেদিন অত বাড়াবাড়ি করেছিল ? আর

মিসেস রাউত? তিনিই বা কেমন মহিলা? আচ্ছা, নিলয় সব চেপে গেল কেন? ও তো বললেই পারত সেদিনের ব্যাপারটা।

বারিদ বলল, আচ্ছা, তোর কি হয়েছে বল তো?

তুলি হাসল। বলল, ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে তাই।

রিয়েলি?—বারিদ প্রায় লাফিয়ে উঠল।

তুলি আরও বেশী করে হাসল। বলল, রিয়েলি। কথাটা ঠিক বারিদকে নকল করে।

বারিদ বলল, হুঁ। মেয়েদের আবার মন আছে নাকি?

তুলি শূন্য চোখে তাকাল। বলল, নেই? সব বুঝি আছে শুধু পুরুষের? ওর চোখে চোখ রাখল তুলি।

কিন্তু বারিদের উত্তরটা ও খেয়াল করল না। নিলয়কেই ও ভাবছিল। ওর খুব দুর্বোধ্য লাগছিল স্বামীকে। দুপুরের আদর-আবেগের সবটুকু স্পর্শ এখনো লেগে আছে ওর ঠোঁটে। নিলয় ওর সঙ্গে হয়ত লুকোচুরি খেলছে, ওর বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

ছেলেরা কখনো সিনসিয়ার হতে পারে না, না রে?—তুলি বারিদকে বলল।

বা রদ বলল, আমায় কি সে সুযোগ তুই দিয়েছিলি?—বারিদের গলায় কৌতুক।

তুলি ঠোঁট উল্‌টে বলল, সুযোগ কেউ কাউকে দেয় না। নিতে হয়।

চোখে একরাশ কৌতূহল ছিটিয়ে বারিদ বলল, তাই নাকি?

তুলির চোখ দুটো কাঁচের জানলায়। ও দেখছিল ধুলোর পুরু সর।

তুলির খেয়াল হল মোহনটা ফাঁকি দিচ্ছে কাজে। ওর মনে হল, আজকাল বড় বেশী ছাই ওড়ে কোক ওভেনের ফ্যাকটরি থেকে। কাঠের জানলাগুলো বন্ধ। বাইরে বৃষ্টির শব্দ।

তুলি ভাবল, নিলয় বড় ভীতু। ওর সাহস নেই, স্ত্রীকে সত্যি কথা বলার। ওই তো সেবার ও যখন লখনৌ গিয়েছিল নিলয়কে একলা এখানে রেখে, তখন তো ও একজনের সঙ্গে ভাবসাব করেছিল। ওদের এই বাড়িতেই ছিল সে। নিলয়ের এক ডাক্তার বান্ধবী।

বারিদ পকেট থেকে একটা চুরুট বার করল। তুলির মনটা এখন এলেমেলো। বলল, এই, তুই চুরুট খাস্ ?

বারিদ বলল, এটা আজে-বাজে চুরুট নয়, অ্যালকাজার। দেখবি কি ফাইন গন্ধ ? চুরুট টেনে বারিদ আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়ল।

তুলি অন্যমনস্ক, সেও যেন গিলে ফেলল ধোঁয়ার কয়েক টুকরো।

তুলির বেশ মনে পড়ছে, লখনৌ থেকে ফিরে এসে ও একদিন দেখতে পেয়েছিল নিলয়ের বিছানার তলায়, অপরিচিত একটা নাইটি। ভদ্রমহিলার কথা ও জেনেছিল অনেক পরে। ও কি তা নিয়ে খুব অশান্তি করেছিল ? আরে দূর ! বরং স্বামীকে ঠাট্টার হাসি হেসে বলেছিল, কি ব্যাপার ? তোমার বন্ধুটি গেস্টরুম ছেড়ে তোমার বেডরুমে আশ্রয় নিয়েছিলেন ? নিলয় আমতা-আমতা করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। ওকে থামিয়ে দিয়ে তুলি বলেছিল, বুঝেছি বুঝেছি, তুমি নিজে বোধহয় গেস্টরুমে থেকে ওঁকে এ-ঘরে পাঠিয়েছিলে ! নিলয় যেন বেঁচে গেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

বারিদের কফি শেষ। ও বলল, নাহ্, শরীরটা আর গরমই হল না। তোর ফ্রিজে মাল-টাল নেই ?

মুখ টিপে হাসল তুলি। বলল, নেই।

বারিদ তবু বেপরোয়াভাবে উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলে বলল, আহ্ ! গ্র্যাণ্ড। ও টেনে নিয়ে এল ভ্যাট সিক্সটি নাইনের বোতলটা। ও বলল, ফাইন। একেবারে বিলিতী।

তুলি বসে বসে দেখছিল ওর সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া জুলুম। ওর মনে পড়ে যাচ্ছিল, হাফ-প্যাণ্ট পরা, ছোট করে চুল-ছাঁটা ছেলেবেলার বারিদকে, যে ওর পড়ার ঘরে গিয়ে জোর করে কেড়ে নিত ছবির বই। প্যাচপেচে বৃষ্টিতে ওকে ল্যাঙ্ মেরে ফেলে দিত মাঠের কাদায়।

গ্লাসে স্কচ ঢেলে জল মেশাল বারিদ। জলের ভাগটাই বেশী। তুলি হাসছিল। ও বুঝতে পারছিল, পানাসক্তির চেয়ে ওর পানের কায়দাটাই বড়।

নিলয় কি আজ মদ খেয়ে ফিরবে? হয়তো তাই। তুলি ভাবল আবার, ও কি শেষ পর্যন্ত মিসেস রাউতের ওখানেই গেল? ও যদি সেখানে গিয়ে থাকে, তবে ওর চোখ দেখলেই টের পাবে তুলি। ও যে ওর ভীষণ চেনা। হা-হা করে হেসে উঠল তুলি।

বারিদ অবাক, ও জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল।

তুলি বলল, নাহ্, হোপলেস। তুই কোন কাজের না।

বারিদ বলল, বেশ তো, শেয়ার কর।

তুলি বলল, যদি হেরে যাস?

চুরুটের ধোঁয়া গিলল বারিদ। বলল, এত দূর! ক্রেডিটটা কার? সাহেবের?

বারিদ নিজেকে দেখিয়ে বলল, না, হতে-পারত নায়কের?

কথাগুলো বলেই ও পিট পিট করে একটু হাসল। ও যেন প্রস্তুত হল পরবর্তী আক্রমণের জন্য। কিন্তু তুলি কিছুই বলল না। ও দেখছিল, ওর হাতের চুরুটের আগুন। ওর চোখে চোখ রাখল বারিদ। তুলি একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। ও বুঝতে পারছিল বারিদের দুর্বলতা। ওর একটা হাতের ওপর বারিদের হাত। বারিদের হাতটা বেশ কাঁপছে।

হাত সরিয়ে নিল তুলি। ভাবল, কি লাভ? দেশলাইয়ের বাক্সটা এলোমেলো নাড়তে নাড়তে হঠাৎ একটা কাঠি বার করল

ও। ফস্ করে ও একটা কাঠি জ্বেলে ফেলল। কাঠিটা পুড়ছে। তুলি তাকিয়ে থাকল। তারপর খানিকটা পুড়ে যাবার পর ও ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল।

বারিদ বলল, ভয় পেলি ?

তুলি বলল, না।

বারিদ বলল, তবে ?

তুলি বলল, দেখতে ভাল লাগছিল না আগুন।

বারিদ বলল, তাই বলে কি আধপোড়া ভাল ?

তুলি অন্যমনস্ক। বারিদের চোখ স্থির, গভীর।

বারিদ চলে গেছে। তুলি দরজা বন্ধ করতে এসে ব্যালকনিতে দাঁড়াল। এখনও বৃষ্টি পড়ছে তেমনি। বাইরে বিদঘুটে অন্ধকার। শালবনের মধ্যে দিয়ে হুইসেল বাজিয়ে চলে গেল কোন এক এক্সপ্রেস ট্রেন। ফ্যাকটরির আগুন উঠছে দূরের আকাশে। ফসফরাসের মতন কি যেন জ্বলছে। বাতাসে এখনও ভাসছে ভ্যাট সিক্সটি নাইনের সঙ্গে মেশানো অ্যালকাজার চুরুটের গন্ধ। ধোঁয়া। তুলির ভাবতে ভাল লাগছে এই মুহূর্তে বারিদের মুখের গন্ধটা। যদিও সে এখন অনেক দূরে। শুধু তার গামবুটের আওয়াজ আসছে ছপ্ ছপ্ ছপ্।

রমলাদের বসার ঘরে

টি-ভি সেটটা যেখানে বসানো হয়েছে, ঠিক ওখানেই ছিল অর্গান। এখন অর্গানটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ভেতরের ঘরে। সেদিনের সেই কিউরিও কেসটা অবশ্য এখনো আছে। যদিও পুতুলের সংখ্যা আরও কিছু বেড়েছে। বুক কেসের পুরনো বইয়ের ভিড়ে আরও গাদা কয়েক নতুন এসে ভিড় করেছে।

এ বাড়ি তখন নতুন হয়েছিল। দেওয়ালের গায়ে চুনকাম। রঙের গন্ধ উঠছিল ঘরের বাতাসে। তবে আজকের মতন এয়ারকনডিশন ছিল না। গোল করে সাজানো এই হাতির মতন বড় বড় কৌচগুলোয় সেদিন ছিল নারকেলের ছোবড়ার গদি। আজ তার বদলে ওখানে উঠেছে ফোম-রবার।

খুব বেশী অদলবদল হয়নি এ ঘরের সাজসজ্জার। কিন্তু মানুষ-গুলো কি দারুণ বদলে গেছে। সাদা হয়ে এসেছে অরুণাংশুর মাথার চুল। গোঁফের রেখায় সাদা সাদা ছোপ। চোখে উঠেছে অনেক পাওয়ারের চশমা।

রমলার সঙ্গে অরুণাংশুর বয়েসের পার্থক্য পুরো দশ বছরের। তাই রমলার চেহারায় এখনও মসৃণ কমনীয় ছাপ। চুলগুলো এখনো যুবতী। তবু কপালে দু-একটা বয়েসের রেখা খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে। মেদ জমেছে শরীরে। সেই দীর্ঘ ছিপছিপে যুবতীটি নেই। পঁয়তাল্লিশের পরের বয়েসটিকে যদি যুবতী বলা যায়, তবে অবশ্য রমলা এখনো যুবতী। যদিও তার চলাফেরায় ভারিক্কি ভাব এসেছে। আজ আর চোখে সেই চপলতা নেই। যে চোখের ধার অরুণাংশুকে মুগ্ধ করেছিল, সেই

চোখ এখন মাতৃত্বের স্নেহধারায় উজ্জ্বল।

টেপ রেকর্ড বাজছে ঘরে। অরুণাংশুর পাশে বসেছিল শুভ্র। রমলার পাশে নীলাঞ্জনা, এ বাড়ির ভাবী পুত্রবধূ। টেপের গানের স্পষ্টতা এখন অনেক কমে এসেছে। ছাব্বিশ বছর আগে শাশুড়ীর অনুরোধে রমলাকে বসতে হয়েছিল অর্গানের পাশে। সেই গানই আজ ভাবী স্ত্রীকে বাজিয়ে শোনাচ্ছে ছেলে শুভ্র, 'দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি···।'

টেপটা অরুণাংশুই বের করেছিলেন নীলাঞ্জনার গান টেপ করবেন বলে। কিন্তু নীলাঞ্জনা চোখেব ইশারায় কি যেন বললো শুভ্রকে। তাই শুভ্র বাবার কথার প্রতিবাদ করে বললো, না না, আগে মায়ের গান শোনা হবে, তারপর—

ও মা! সেই কতকাল আগের···। না না, শুভ্র।—বিব্রত-ভাবে রমলা বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। ভাবী শাশুড়ীর পাশে বসে নীলাঞ্জনা লাজুক-লাজুক হাসছিল এতক্ষণ। টেপটা বাজতেই ও নড়ে-চড়ে বসলো। চোখে কৌতূহল ফুটে উঠলো ওর! বললো, ইস্! কি মিষ্টি গলা! আপনি এখনো গান?

রিম্‌লেস চশমার মধ্যে দিয়ে নরম চোখে দেখলেন রমলা নীলাঞ্জনাকে। আবেগে ওঁর গলাটা বুজে এলো, যেন বললেন, তেমন চর্চা নেই। তবে তুমি এলে তোমার সঙ্গেই না হয় শুরু করবো নতুন করে।

ঠোঁট কেটে হাসলো নীলাঞ্জনা। শুভ্রও তাকালো একবার মায়ের দিকে। ওর সেই চাহনিতে খুশির ছোঁওয়া। অরুণাংশু চোখ বুজে চুরুট টেনে চলেছেন। উনি যেন অনুভব করছেন ছাব্বিশ বছর আগের যৌবন। এই গান হয়তো ওঁকেও টেনে নিয়ে চলেছে সেই পুরনো দিনে।

রমলার চোখ দুটো তখন ধূসর আকাশে। স্মৃতিচারণ করছিলেন

রমলা। উনি যেন পায়ে পায়ে হেঁটে গেলেন অনেক বছর আগে, যেদিন এই বসার ঘরেই আসর বসেছিল। সেদিন তাঁর শাশুড়ীও এমনি আদর করেই কাছে বসিয়েছিলেন তাঁকে। হালকা নীল আলো জ্বলছিল। ঘরের মধ্যে টুঁ শব্দটি নেই। শুধু দেওয়াল-ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ। শ্বশুর নলিনীকান্ত পাইপ টেনে চলেছেন। শাশুড়ী হেমপ্রভা স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন। অরুণাংশু বসেছিলেন বাবার পাশে, মায়ের পাশে রমলা। ঠিক ছাব্বিশ বছর আগের সেই ছবিই যেন আজ এ-ঘরে আবার ফুটে উঠলো। এমনও হয়! অবশ্য ওই দৃশ্য রমলার এখনো মাঝে মাঝে মনে পড়ে যখনই অর্গানের রিড টেপেন। বড় আনন্দ পান স্মৃতিচারণে। সেদিন তাঁর শাশুড়ীও গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েছিলেন। সস্নেহে শ্বশুর বলেছিলেন, একখানা গান শোনাও, মা। শুনেছি চমৎকার গলা তোমার। শ্বশুর বলেছিলেন, আমার এই টেপ-এ ধরা থাক তোমার গান।

আজ যেমন ভাবী পুত্রবধূর গান টেপ করছেন অরুণাংশু, নলিনীকান্তও সেদিন টেপ করলেন সদ্য বিলেত থেকে কিনে আনা টেপ-রেকর্ডে ভাবী পুত্রবধূর গান।

এখনকার মতন তখনকার দিনে তো ঘরে ঘরে টেপ রেকর্ডার ছিল না। অতএব টেপে গলা ধরে রাখার মতন রেওয়াজও তখন হয়নি। তাই আত্মীয়-স্বজন মহলে রমলার গান শুনিয়ে শুনিয়ে নলিনীকান্ত বাহাদুরির হাসি হাসতেন।

রেকর্ডিং-এর সময় বসেছিলেন অরুণাংশু। দু-একবার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল তাঁদের। রমলার সলজ্জ চাহনি, অরুণাংশুর চোখে মুগ্ধতা। নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন অরুণাংশু।

বি এ-তে কি কমবিনেশন নিয়েছেন আপনি?—ব্যস, এই পর্যন্তই ছিল ভাবী স্ত্রীর কাছে তাঁর জিজ্ঞাসা। আর রমলা তো একেবারেই নির্বাক। এই যুবক তার ভাবী স্বামী, এই কথাটি

যখন জানা হয়ে গেছে, এরপর তাঁর মুখে কথা থাকেই বা কি করে? শাশুড়ী জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর ছেলেকে ওঁর ভাল লেগেছে কি না? রমলা বলেছিলেন, লেগেছে।—শুধু এ কথাটি বলেই শামুকের খোলের মধ্যে তিনি যেন আড়াল খুঁজেছিলেন। যদিও অনেক কিছুই জিজ্ঞাসা ছিল তাঁর, অনেক কৌতূহলও…। তবু মনের সেই অদম্য কৌতূহলটুকু তিনি চেপেই রেখেছিলেন। ক'দিন পরই তো তাঁকে জানা যাবে, এই আশায়।

বসে বসে রমলা তাই ভাবছিলেন, সেদিনের সেই অপরিচিত যুবক আজ কেমন কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। সেই যুবকের সঙ্গে আজকের মানুষটির যেন কোন মিল নেই। যেমন মিল নেই, রেকর্ডের গানের মেয়েটির সঙ্গে আজকের রমলার। আজকের এই প্রৌঢ়া রমলা, পক্ককেশী, ওই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি যে অনেক বদলে গেছেন। কোথায় গেল সেই একান্ত নিভৃতে দু'জনের চাওয়া-পাওয়া। এখন দু'জনে মুখোমুখি বসে থাকলেই যে সংসারের কথা এসে পড়ে। মতের অমিল হলেই কিছু কথা-কাটাকাটি। দিনগুলো এমন করে হারিয়ে যায় কেন? শুভ্রদেরও কি এমনি দশা হবে? নীলাঞ্জনার কি থাকবে চিরদিন শুভ্রের ওপরে এই দুর্বার আকর্ষণ? এসব প্রশ্ন মনের মধ্যে খেলা করে রমলার।

শুভ্রর দিকে তাকালেন রমলা। দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল তাঁর সেই ছোট্ট সোনা। দিনের রঙ বদলায়, মানুষের মন বদলায়, বড় আশ্চর্য এ পৃথিবী!

টান টান চোখে তাকিয়ে আছে শুভ্র নীলাঞ্জনার দিকে। মুচকি হাসছে নীলাঞ্জনাও। সেও অপলকে দেখছে শুভ্রকে। ওরা কি একেবারেই অর্বাচীনের দলে ঠেলে ফেললো তাঁদের? কত বদলে গেছে দিনকাল। ভাবলেন রমলা, এরা কত সহজ হতে পারছে। প্রাক্-বিবাহযুগে এদের একের অন্যকে জানার

কত বেশী স্বাধীনতা। তাঁরা পাননি সে সুযোগ। এমন কি বিয়ের পরেই বা কতটুকু পেয়েছিলেন? অরুণাংশু তো শুভ্রর মতন ছিলেন না। তিনি ছিলেন লাজুক, ভীতু পুরুষ। বাবা-মায়ের সামনে স্ত্রীর কাছে আসতে লজ্জা পেতেন। ফলে রমলাও যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে যেতেন। ছাব্বিশ বছর কি খুব বেশী দিন আগের কথা? ভাবলেন রমলা। পাঁচ বছর একা থাকতে হয়েছিল তাঁদের। অরুণাংশু গেলেন বিলেতে। শাশুড়ীর আর্জি ছিল পুত্রবধূর কাছে, তোমায় কিন্তু মা আমাদের কাছেই থাকতে হবে।

রমলা বলতে পারেননি, কেন? ওঁর ঠোঁট নড়ে উঠেছে, তবু···। কান্নায় গলা আটকে এসেছে। তবু উনি শুনে গেছেন শাশুড়ীর কথা, যতদিন অরু ফিরে না আসে এফ-আর-সি-এস করে।

নিজের ঘরে গিয়ে কেঁদেছেন রমলা। কেঁদে কেঁদে অরুণাংশুর বুক ভিজিয়ে দিয়েছেন। অরুণাংশু চাপা রাগে ফেটে পড়েছেন, কেন স্ত্রীকে বিলেতে নিয়ে যাবার অধিকার তাঁর নেই? কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেননি বাবা-মাকে।

কিন্তু সেদিনের সেই ছেলের বউ, আজকের শাশুড়ী রমলা সম্পূর্ণ অন্য কথা বলতে শিখেছেন। শুভ্রকে বলেছেন, যেখানেই যাও, বউকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

নীলাঞ্জনা বলেছে, কিন্তু আমার পড়াশুনো?

ওদেশে গিয়ে কি কেউ পড়ে না?—শ্বশুর বলেছেন, আমি চাই তোমরা কাছাকাছি থাকো। বিয়ের পরই একেবারে ছাড়াছাড়ি হওয়া ভালো নয়। আমরা নিজেরা ভুক্তভোগী কিনা? কথাটা বলেই অরুণাংশু তাকিয়েছিলেন রমলার দিকে। মুচকি হেসেছিলেন রমলা। মাথা নেড়ে সায় দিলেন স্বামীর কথায়। বিলেত থেকে চিঠি লিখতেন অরুণাংশু, পড়াশুনো আমার শিকেয়

উঠেছে। বইয়ের পাতায় সারাক্ষণ বউয়ের মুখ।···

ব্যাকুল আগ্রহে অক্ষরগুলো গিলতেন রমলা। ব্লাউজের তলায় বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন অরুণাংশুর চিঠি। এক চিঠি হাজার বার পড়তেন, কখনো বাথরুমে গিয়ে, কখনো শোবার ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে। জেগে জেগেই কেটে যেত কত রাত। চোখের সামনেই ভোর হতো। প্যাডের কাগজ ভরিয়ে ফেলতেন, অরুণাংশুকে চিঠি লিখে লিখে। তাড়াতাড়ি চলে এসো···। তুমি চলে এসো···ভাল লাগে না, একা-একা, অসহ্য··· অসহ্য।

পরদিন শাশুড়ী দেখতেন চোখের তলায় কালি। চমকে উঠতেন হেমপ্রভা। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কি যে আদর করতেন! ভুলিয়ে দিতেন মায়ের অভাব, তুমি রাত্তিরে ঘুমোও না, মা?

ছেলের বউয়ের ব্যথা ছুঁয়ে যেত শাশুড়ীর বুকে। তখন দু'জনের চোখই জলে ভরা। একজনের ছেলে, আর একজনের স্বামীর বিরহ ওদের দু'জনকে বড় বেশী স্পর্শ করত যেন। গভীর মমতায় শাশুড়ী বলতেন, আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরো, মা। অরু এই এলো বলে। ওর কোর্সটা শেষ হলে তো তোমারই ভাল হবে।

হেমপ্রভার সেই ছেলের বউই তো আজ হয়েছেন শাশুড়ী। তাই তাঁর ছেলের একা বিদেশ যাবার বিরুদ্ধে তাঁর এতো বিদ্রোহ। নতুন বিয়ের পর পরই একেবারে অদর্শন! এই অদর্শনের যন্ত্রণা যে কি দারুণ, তা তাঁর মত করে আর কে বুঝবে? বুঝতে পারতেন, হয়ত রমলার শাশুড়ীও। তাঁর ভাগ্যেও এই দশাই ঘটেছিল কিনা? কিন্তু তবুও তিনি ছেলের বউয়ের বেলায় কোন প্রতিকার করেননি, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীই যে ছিল আলাদা। কি অসম্ভব ব্যাপার, বউ যাবে ছেলের সঙ্গে বিলেতে

পড়তে? অথচ এমন কি বেশীদিন আগের কথা, রমলার উদার শাশুড়ীর মাথায় এই চিন্তাটা এলো না কেন? দেওয়ালে টাঙানো ওঁদের যুগল ফটোর দিকে তাকালেন রমলা। অপত্য-স্নেহ ঝরে পড়ছে যেন হেমপ্রভার চোখে, সস্নেহে হাসছেন নলিনীকান্ত।

যে সংসারে ছেলের বউ নির্বাচিত হয় শাশুড়ীর পছন্দে, সে সংসারে ছেলের বউয়ের সম্মানই আলাদা। প্রতি পদে পদে রমলা সেকথা অনুভব করতেন। হেমপ্রভার পছন্দেই তো এ বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। রমলা যেন ছিলেন ওঁর আবিষ্কার। আজ যেমন নীলাঞ্জনা রমলার আবিষ্কার। সংসারে সব ছেলের বউয়ের ভাগ্যে এটা ঘটে না। সবাই শাশুড়ীর আদর পায় না। কেউ কেউ পায়। এক আত্মীয়ের বিয়েতে ওঁকে দেখেছিলেন হেমপ্রভা। এতো রঙ, এতো রূপ! তুমি কে মা? প্রথম দর্শনেই প্রেম। রমলাকে দেখেই ভালবেসে ফেললেন হেমপ্রভা। সেই বিয়েবাড়িতেই বলতে গেলে একরকম জোর করে কথা আদায় করলেন তিনি রমলার বাবা-মায়ের কাছ থেকে। আমার মেয়ে নেই, ও-ই আমার সেই মেয়ে। আমি এতদিন ধরে যেন ওকেই খুঁজছিলুম। এতো বড় ফাঁকা বাড়ি, একটা মেয়ের অভাবে বড়ই যেন শূন্য শূন্য লাগে। ছেলে তো ঘোরে বাইরে বাইরেই। ও দিব্যি ঘুরবে-ঘারবে, আবদার করবে, মা বলে ডাকবে।

সেই একই ঘটনারই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটলো ছাব্বিশ বছর পরে এ বাড়িতে আবার। রমলা তো কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেননি যে, এমন ঘটনা ঘটবে। শুভ্র আজকালকার ছেলে, ও নিজেই দেখেশুনে বিয়ে করুক। যাকে খুশী ঘরে আনুক। তার সুখেই তাঁদের সুখ। এই ধারণা নিয়েই তো রমলা বসেছিলেন এতদিন। কিন্তু নীলাঞ্জনা তাঁর যেন সব গোলমাল করে দিল। শাশুড়ীর মতন অবাকবিস্ময়ে তিনিও ভাবলেন, শুভ্রর সঙ্গে যে একেই

মানায়!

এক ঝড়-বৃষ্টির সন্ধ্যায় কলকাতা শহর যখন ভেসে যাচ্ছে, ফুটপাথের অগণিত মানুষ যখন ছুটছে, সেই তখন নীলাঞ্জনাকে চোখে পড়ে গেল রমলার। কলেজ স্ট্রীটে মার্কেটিং করতে গিয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ বৃষ্টি আসায় ছুটে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, হাতে একগাদা প্যাকেট, এমন সময় নীলাঞ্জনা যেন দেখা দিল সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতন। দাঁড়িয়ে পড়লেন রমলা। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন মেয়েটির। রমলা কাকভেজা হয়ে ছুটতে দেখলেন, ওই দারুণ মিষ্টি মেয়েটিকে। হাতে কলেজ ফাইল, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ সেরে বাড়ি ফিরছিল নীলাঞ্জনা।

তুমি কি প্রেসিডেন্সীতে পড়?

হ্যাঁ—ভারী অদ্ভুতভাবে তাকালো নীলাঞ্জনা।

কোথায় থাকো তুমি?

কেন বলুন তো?

আমি একটা লিফট দিতে পারি কিনা তাই ভাবছি।

ওঁর বলার ধরনে হেসে ফেললো নীলাঞ্জনা। বললো, নিউ আলীপুরে।

কি আশ্চর্য, আমিও যে ওদিকেই থাকি। এসো, এসো। প্রায় একরকম জোর করেই কাছে টেনে নিলেন রমলা। বললেন, আমি তোমার মায়ের মতন, আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি করো না।

গাড়িতে আসতে আসতে অনেক কিছুই জেনে নিলেন তিনি। ওর বাবা-মায়ের পরিচয়। নিউ আলীপুরে কোন্ ব্লকে ওরা থাকে ইত্যাদি, ইত্যাদি। পি ব্লকে ওর বাড়ির গেটে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন রমলা। বাড়ি ফিরেই অরুণাংশুকে জানালেন সব কথা। অরুণাংশু বললেন, আমি বিয়ে করেছিলুম আমার অভিভাবকের কথায়, তোমার ছেলে কি তা করবে?

বড় ভয় ছিল রমলার ছেলেকে নিয়ে। মেয়েকে নিয়েও…।

কিন্তু শুভ্র আনন্দে মত দিল নীলাঞ্জনাকে দেখেই। নীলাঞ্জনারও ভালো লাগলো শুভ্রকে। আপত্তি হ'ল না ওর বাবা মায়েরও। পালটা ঘর, অমন কার্তিকের মতন ছেলে···। বিয়ে যখন দিতেই হবে। এরপর দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা চললো প্রাক্‌বিবাহ যুগে। আজকের দিনে এটা যে প্রয়োজন, একথা বোঝেন ওঁরা। একজন আর একজনকে জানবে, চিনবে। নইলে সারা জীবনের সঙ্গী করবে কি করে?

চুরুট পুড়ছে অরুণাংশুর হাতে। চোখ বুজে বসে আছেন তিনি। রমলা গাইছেন, আঁখি তব ছল ছল···। যুবক অরুণাংশুর মুখ মনে পড়ছে রমলার। বাবা মায়ের সামনে তাঁর গোবেচারী ভাব।

বিলেত গেলেন যেদিন, দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে গেলেন শ্বশুর, শাশুড়ীর সঙ্গে রমলাও। সেদিন গাড়িতে যেতে যেতে নিতান্ত বাধ্য ছেলের মতন বাবা মায়ের উপদেশবাণী শুনে গেলেন অরুণাংশু। একবারও ফিরে তাকালেন না স্ত্রীর দিকে। এমন কি এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসেও বাবা-মায়ের মন রক্ষাই করছিলেন তিনি। আদর্শবান পুত্রের কাজ আর কি! অভিমানে চোখ ফেটে জল আসছিল রমলার। শাশুড়ী বোধহয় বুঝতে পারলেন। তাই আত্মভোলা স্বামীকে একটা ধমক মেরে বললেন, তোমার কথা এবারে থামাও। ওদের দু'জনকে কথা বলার সুযোগ দাও।

ইস্! তাই তো? অপ্রতিভভাবে হাসলেন নলিনীকান্ত।

মা বাবা সরে যেতেই অরুণাংশু বললেন, কি গো কথা বলবে না?

রমলার পরনে টুকটুকে লাল একখানা দামী শাড়ি। মাথায় ঘোমটা-টানা জড়ির আঁচল। গা-ভরা গহনা। সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। শাড়িতে গয়নায় ঝলমল করছেন রমলা, অরুণাংশুর কথায়

সর্পিণীর মতন তাকালেন। যদিও চোখে জল। কিন্তু সে চোখে যেন আগুন ফেটে পড়ছে। স্ত্রীর হাত ধরলেন অরুণাংশু। বললেন, আমার একটুও ইচ্ছে করছে না গো তোমায় রেখে যেতে।

চাপা গর্জন করে উঠলেন রমলা, থাক, খুব হয়েছে।

বিশ্বাস করো। অরুণাংশুর গলায় আবেগ। কান্নার সুর।

তবে যাচ্ছো কেন?

উপায় নেই।

তাই শুভ্র যখন হাসে, কথা বলে নীলাঞ্জনার সঙ্গে, মা-বাবার সামনে সঙ্কোচ না করে, বুকটা যেন ভরে যায় রমলার। শুভ্রটা ওকে ক্ষেপায়, খুনসুটি করে। কৃত্রিম কোপে তাকায় নীলাঞ্জনা। নালিশ করে রমলার কাছে, ও আমার ওপরে এতো খবরদারি কেন করে বলুন তো?

এই শুভো! ধমক দেন রমলা, তুমি ওকে জ্বালিও না বলছি।

তোমার এই পক্ষপাতিত্ব ভাল নয়, মা।

বড় ভালো লাগে ওদের এই মধুর সম্পর্ক। কিন্তু বুকের মধ্যে কোথায় যেন এক টুক্‌রো ব্যথাও থেকে যায়। নিজেদের কথা মনে পড়ে। যেদিন তাঁদের যৌবন কেঁদেছিল এই মধুর সম্পর্কটুকু পাবার লোভে। পাঁচ বছর পর ফিরেছিলেন অরুণাংশু। পৃথিবীতে মানুষের বয়েস তো অনেক। এই দীর্ঘ বয়েসের সীমারেখায় পাঁচটি বছর কি খুব বেশী কিছু? কিন্তু ওই পাঁচটি বছরই যে পাঁচটি যুগের মতন সরে সরে গিয়েছিল দূরে। প্রথম যৌবনের ক্ষুধিত দিনগুলোয় যখন প্রিয়জনের সান্নিধ্য চায় মানুষ, দুটি অতৃপ্ত শরীর, হৃদয় যখন এক হতে চায়, সেই তখন ওঁরা একা হয়ে গিয়েছিলেন।

দেওয়ালের গায়ে সারি সারি ঝুলছে কয়েকটা ফোটো। দাদা-

শ্বশুর, দিদিশাশুড়ীর, রমলার শ্বশুর-শাশুড়ীর। বড় ক্ষোভে রমলা আজ তাকালেন ওই ছবির দিকে। ওখানে রোজ ধূপ-ধুনো পড়ে সকালে, সন্ধ্যায়। রমলা ভালবেসে ধূপ-ধুনো দেন। কিন্তু কেন? একদিন ওই ছবিগুলোর পাশে আরো তু'খানা ছবি গিয়ে ভিড় জমাবে। নীলাঞ্জনা দেবে ধূপ-ধুনো। হয়তো আরোও কত অদল-বদল হবে এই বসার ঘরের। নীলাঞ্জনার মনেও কি কোন কথা জমবে সেদিন? সেও কি ভাববে, আজ যেমন করে রমলা ভাবছেন? হেমপ্রভা কি কখনো ভেবেছিলেন? তাঁর মনেও কি জমেছিল কোন বিক্ষোভ দিদিশাশুড়ীর বিরুদ্ধে? অনেক বছর পর রমলা আজ খুঁজে খুঁজে চললেন, তাঁদের চোখে তাঁর চোখের জ্বালা।

গান ফুরিয়ে গেল। অরুণাংশুর চোখে যেন সেই যুবককালের মুগ্ধতা। চুরুটের মাথায় প্রচুর ছাই জমেছে। তবু খেয়াল নেই। রমলা বুঝতে পারলেন না, অরুণাংশুর কিছু পুরনো কথা মনে পড়েছে কিনা। উচ্ছ্বসিত নীলাঞ্জনা বললো, এতো ভালো গলা আপনার!

শুভ্র বললো, আজ্ঞে ম্যাডাম, আমার মায়ের গলা কিনা!

ইয়ার্কির ছলে আরো বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল শুভ্র, কিন্তু নীলাঞ্জনার চোখে চোখ পড়তেই ও থেমে গেল। ওরা একে অন্যকে দেখলো পরিপূর্ণ চোখে। এ যেন সেই যুবককালের অরুণাংশু রমলা।

আজ কিন্তু আপনাকে আবার গাইতে হবে।—বললো নীলাঞ্জনা ভাবী শাশুড়ীকে।

আবার আমাকে? ভাবলেশহীন চোখে তাকালেন রমলা।

মুচকি মুচকি হাসছিলেন অরুণাংশু। চুরুট টেনে বললেন, উঁহু, তোমাকে গাইতে হবে নীলাঞ্জনা। আমি টেপ্ করবো, ছাব্বিশ বছর পর তোমার ছেলের বউ এসে শুনবে। আর এই টেপ্-এ এখন আর কারো গানই থাকবে না। শুধু আমার

নাতবউ এসে গাইবে।

হেসে উঠলেন বমলা। লজ্জায় লাল হল নীলাঞ্জনা। শুভ্রর সঙ্গে এই মুহূর্তে ওর চোখাচোখি হল আরেকবার। ভারী ভালো লাগলো রমলাব।

হাসতে হাসতে রমলা বললেন অরুণাংশুকে, তোমায় গ্র্যাণ্ডফাদার হলে কিন্তু চমৎকাব মানাবে।

অরুণাংশু বললেন, আর তোমায় গ্র্যাণ্ডমাদার হলে···।

হাসতে লাগলেন অরুণাংশু, রমলা। দেওয়ালে টাঙানো দুই পুরুষের ছবি ওঁদেব চোখেব সামনে দুলতে লাগলো বাব বার।

সো নি য়া

বিরাট কনসার্ট হলের এক কোণে একটা বুদ্ধমূর্তি। সেই বুদ্ধমূর্তি থেকে ঠিকরে পড়ছে আলোর খেলা। জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে নানা রঙের আলোর বুদ্ধমূর্তি। কনসার্ট হলের অন্য কোণে ক্রুশবিদ্ধ যীশু। সত্য-সুন্দরের প্রতিমূর্তি বুদ্ধ, যীশু। সেণ্ট পিটার স্কুলের ফাদার কনসার্ট হলে তাই হয়ত রেখেছেন তাঁদেব। এখানে যাঁরা নাচে, অভিনয় করে, সেই কিশোর-কিশোরী অথবা যুবক-যুবতীরা যীশুর মতোই সত্যের প্রতীক হোক, বুদ্ধের মতন সুন্দর হোক।

বর্ষার ঢল নেমেছে এই পাহাড়ী শহরে। বাইরে চলছে টিপ্ টিপ্ রিমঝিম একটানা বৃষ্টি। কনসার্ট হলের ভেতরে জোর বাজনা বাজছে। রেকর্ডে বাজছে, হোয়েন আই ওয়াজ ইয়াং···। ড্যান্সফ্লোরে নাচছে সদ্য যৌবন ছুঁয়ে-যাওয়া কিছু তরুণ-তরুণী। সেণ্ট পিটার স্কুলের সোস্যালে নাচতে এসেছে সেণ্ট মেরী স্কুলের মেয়েরা। সেই মেয়েদের মধ্যে সোনিয়াও একজন। ও নাচে মন দিতে পারছে না। বাইরের বৃষ্টির শব্দ রেকর্ডের বাজনাকে ভ্রূকুটি করছে যেন। তাল কেটে যাচ্ছে সোনিয়ার। হাসছে অবন। লজ্জা পেয়ে সোনিয়া বললো, সরি।—ও আবার মনোযোগ দিল বল নাচে। কালো ম্যাক্সির মধ্যে ঢাকা ওর ছিপছিপে ফর্সা শরীর। ডিমের মতন লম্বাটে মুখে আশ্চর্য কমনীয় ছাপ। বড়-বড় চোখের পাতার নীচে একজোড়া চোখ। চোখের দৃষ্টি শূন্য, উদাস।

দূরে কোথায় যেন ধ্বস নেমেছে। বোধহয় কোন নেপালী

বস্তিতে। ল্যাণ্ডরোভারে আসার সময়ে ও শুনেছিল।···আজো ও ওর বাবাকে দেখেছিল। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাচ্ছিলেন বাবা! হাতে ক্যানভাস, রঙ, তুলি। বিপভ্যান্ উইঙ্কেলের মতন যেন বিশ বছর পব হাঁটছিলেন বাবা। চোখভরা শুধু বিস্ময়, কৌতূহল, অগোছালো পা ফেলার ভঙ্গি। সোনিয়ার খুব ইচ্ছে করছিল বাবাকে একবাব বলতে, আমি সোস্যালে যাচ্ছি বাবা। এটাই আমার স্কুলের শেষ সোস্যাল।···কিন্তু ও বলতে পাবেনি। ল্যাণ্ডরোভারটা তার আগেই ছুটে গিয়েছিল জলাপাহাড়ের দিকে।·· কোথায় গেল তাব বাবা নেপালী বস্তিব দিকে? ধ্বসটা যে ওদিকেই নেমেছে!

অবন বললো, ইউ আর লুকিং সো গ্লুমি। আর ইউ নট হ্যাপি টু ড্যান্স উইথ মী?

ও, নো। প্লিজ পাবডন মী।

এম সি-রা ঘুবে ঘুবে দেখছে সোস্যাল। ফাদারবা ভার দিয়েছেন ওদের ওপর। কোন বেয়াদপি যেন না হয়। উঠতি যৌবনের জোয়ারের তোড়ে ওবা যেন ভেসে না যায়। কিন্তু পাহারাদার একটু অসাবধান হলেই ঘটে যাচ্ছে অনেক ঘটনা। সোনিয়া হঠাৎ দেখলো, ভাটনগব একটা চুমু খেয়ে ফেললেন রূপাকে। তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো রূপার ঠোঁটে। ভাটনগরের চোখে তখন ভালবাসার আশ্চর্য প্রতিশ্রুতি! বার্চ গাছের ঝোপঝাড় দিয়ে তৈরী পার্টিশনের ওপাশে স্ন্যাকবার, ওখানে মদ নেই। রয়েছে কোকাকোলা, অরেঞ্জ স্কোযাস, স্ন্যাক্স। ভাটনগর রূপাকে নিয়ে নাচতে নাচতে আড়াল খুঁজলো সেখানে। আধো আলো আধো ছায়ার মোহময় পরিবেশে ভাটনগর বোধহয় একটু নির্জনতা চাইলো। বেচাবী রূপা! সোনিযা জানে, ভাটনগরকে ভালবেসে ফেলেছিল রূপা গতবারের সোস্যালের পর থেকে। আর আশ্চর্য, ওদের কী ভাগ্য! ওরা এবারেও একই সঙ্গে নাচছে। কিন্তু সোনিয়া? ও যে নাচতে চেয়েছিল রূপঙ্করের সঙ্গে! হল না। ও নাচছে

অবনের সঙ্গে। একেই বলে নসিব।

এই সোস্যালে আসার আগে ও যে একজনের মুখই ভেবেছিল। সে রূপঙ্কর। কিন্তু ড্যান্সফ্লোরে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা যখন বক্স নিয়ে এগিয়ে এলো, বললো, প্লিজ পিক আ পিস্ অফ্ পেপার।—সোনিয়া তখন যে কাগজটা তুলে নিয়েছিল, তাতে অবনের নামই লেখা ছিল। যে কাগজে যার নাম লেখা থাকবে, তার সঙ্গেই বিনা দ্বিধায় নাচতে হবে। এটাই প্রচলিত প্রথা। অতএব দারুণ অপছন্দ সত্ত্বেও ভাঙা মন নিয়ে সোনিয়া গিয়ে দাঁড়ালো অবনের পাশে।

রূপঙ্কর তার দিকে একবারও তাকাচ্ছে না কেন? সে কি খুশী হচ্ছে এষার সঙ্গে নাচতে? কনসার্ট হলে ঢুকতেই ওকে দারুণ হাসিখুশী দেখেছিল সোনিয়া। ধবধবে সাদা একটা প্যারালাল পরেছে রূপঙ্কর। গায়ে মেরুন রঙের সার্ট। ওর চোখের মণি দুটো কেমন নীল! বাঙালী ছেলে বলেই মনে হয় না যেন। যেন কোন সাগরপারের ইঙ্গিত ওর চোখে। আচ্ছা, রূপঙ্করের মা নিশ্চয় বাঙালী নয়, কিংবা বাবা? এসব কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি ওর। ক'দিনেরই বা আলাপ! জিজ্ঞেস করেই বা কি হবে। ওরা থাকে তো গুজরাটে।

ওর হাতের মুঠোয় চাপ দিল অবন। নরম করে হাসলো। নায়কোচিত ভঙ্গীতে তাকালো। অবন বললো, আই লাইক ইউ ভেরী মাচ। বাট আর ইউ নট ইনটারেস্টেড ইন মী?

হাসলো সোনিয়া। হাসির টোল পড়লো ওর আপেলের মতন টুকটুকে গাল দুটোয়। ও কেটে কেটে বললো, আই নো অ্যাবাউট ইউ। তোমার সম্বন্ধে আমি জানি।

ভুরু কুঁচকে অবন বললো, মাই গুড্‌নেস। আমার সম্বন্ধে তুমি কি জানো?

তুমি ক্লাশ ইলেভেনে পড়! তুমি এই স্কুলেরই বোর্ডার।

হেসে উঠলো অবন। বললো, শুধু এটুকু জেনেই সন্তুষ্ট, সো ফানি গার্ল!

কোথায় থামতে হয়, সোনিয়া তা জানে। তাই ও এখানেই চুপ করে গেল। রূপঙ্করের সঙ্গেও তো ওর গতবার সোস্যালে ঠিক এই ভাবেই আলাপ। হোয়াটস্ ইওর নেম? হোয়ার ডু ইউ কাম ফ্রম?

তারপর সোস্যালের শেষে রূপঙ্কর ওর হাত ধরে বললো, প্লিজ কিপ্ কনটাক্‌ট উইথ মী। তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো।

রূপঙ্করের কথা তো রেখেছিল সোনিয়া। কিন্তু রূপঙ্কর বদলে গেল কেন? ভাবাই যায় না, এ সেই কয়েক মাস আগের রূপঙ্কর। সোনিয়াকে দেখে কথা বললো না কেন? বড্ড খামখেয়ালী ছেলে আছে বাবা। মনে মনে হাসলো সোনিয়া।

আজ সোস্যালে আসার আগেই ওর কেন যেন মনে হয়েছিল, ওকে আশাহত হতে হবে। কেন যে এই কালো ম্যাক্সিটা পরেছিল ও! এটা পরলে সোনিয়াকে কিন্তু দারুণ দেখায়। অথচ যেদিনই ও এটা পরে সেদিনই ওর সমস্ত স্বপ্নগুলো সাবানের ফেনার মতন উড়ে যায়। কীই-বা ওর স্বপ্ন? ছোট ছোট কতগুলো আশা। ছোট ছোট কতগুলো ভাললাগা। খুব বেশী বড় স্বপ্নের কথা ভাবতে ভয় পায় ও। কেননা, ছোটবেলা থেকেই ও দেখে আসছে, ও যখন যা চেয়েছে তা ও পায়নি। সোনিয়া কোনদিন ডল পুতুল চায়নি, কিংবা খেলাঘরের কোন সংসার। ওর মতন ওই বয়সের মেয়েরা যা চেয়ে থাকে। ও চেয়েছিল, মা-বাবার হাসিমুখ দেখতে। সোনিয়াকে ঘিরে মা-বাবার একটা সুন্দর জগৎ। কিন্তু তা ও পায়নি। মা আর বাবার ঝগড়াঝাটি, অশান্তিময় জীবনই শুধু ও দেখেছে জ্ঞান হবার পর থেকে। সোনিয়া দেখেছে, এই পৃথিবীর আলো যাঁরা

দেখিয়েছেন, ওর সেই অতি প্রিয় আপনজনেরা যেন দুই বিপরীত শত্রু-শিবির। তাঁরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেন না। সোনিয়া তাই হাসতে ভুলে গিয়েছিল। আর পাঁচটা মেয়ের মতন হেসে-খেলে ও বড় হয়নি। ওই তো এষা, যে এখন রূপঙ্করের সঙ্গে নাচছে, সে তো থাকে ওর বাড়ির খুব কাছেই ল্যাডেন লা রোডে। কিন্তু এষার বাড়ির আবহাওয়া তো আর সোনিয়ার মতো নয়। ওব বাড়ির আবহাওয়াই আলাদা। এষার বাবা-মা ফুর্তিফার্তা করে বেড়ান, মদ খেয়ে নাচেন, লেবঙ রেসকোর্সে যান। কিন্তু ওঁদের দু'জনের মধ্যে কোন ফাটল নেই। মা বাবার ঝগড়া দেখেনি এষা। ওদের বাড়ির পরিবেশে যেন প্রাণ আছে, প্রাচুর্য আছে, আনন্দ আছে।

আর সোনিয়া? ওর মনে পড়ে, ছেলেবেলায় ওর বাবা প্রায়ই বেপাত্তা হয়ে যেতেন। সাত দিন, আট দিন বাবার কোন খবরই নেই। তখন খুব অসহায় বোধ করতেন মা। পাগলের মতন বাবাকে খুঁজে বেড়াতেন। টাকা নেই, পয়সা নেই। কি বিচ্ছিরি অবস্থা। সোনিয়া জানে, তার মায়ের সেই অসহায় অবস্থার সুযোগই নিয়েছিলেন মিস্টার চৌধুরী, তার মা এখন যাঁর রক্ষিতা। ইস! তার মা কেপ্‌ট, রক্ষিতা! কথাটা ভাবতেই সোনিয়া যেন কেমন শিউরে ওঠে। মার ওপরে ঘেন্না? ঠিক তা নয়। দুঃখ? কি জানি কি এক মিশ্র অনুভূতিতে ভরে যায় মন। অথচ এ ছাড়া তো মার কোন উপায় ছিল না। মিস্টার চৌধুরী মার প্রেমে পড়েছিলেন, আর তার মা তাঁর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছেন। মা সহ্য করতে পারেননি, সোনিয়ার ক্ষ্যাপাটে শিল্পী বাবাকে। যাঁকে কখনো দেখা যেতো কাকঝোরায়, কখনো হিলকার্ট রোডে ছবি আঁকতে। যদিও ভালবেসেই বিয়ে করে-ছিলেন মা। কিন্তু সেই ভালবাসার মূল্য দেননি বাবা। ছোট হলেও সোনিয়া অনেক কিছুই বুঝতে পারতো। মার জন্যে

দুঃখ হতো ওর, বাবার জন্যে সহানুভূতি। বাড়ির ওই অস্বস্তিকর পরিবেশই ওকে ভাবুক এবং অতিমাত্রায় গম্ভীর করে তুলেছিল। কিন্তু ওর সেই গাম্ভীর্যের মুখোশ খুলে দিয়েছিল রূপঙ্কর। ঝড়ের পাখির মতন এলো যেন ও। ওকে ভাঙলো, গড়লো। ওর সমস্ত কিছু ওলোট-পালোট করে দিয়ে গেল।

সোনিয়া আড়চোখে দেখলো রূপঙ্করকে। অভিমানে ওর বুকটা দুলে উঠলো। ও নাচছে এষার সঙ্গে। রূপঙ্কর সোনিয়ার দিকে একবারও তাকাচ্ছে না কেন? ও কি পছন্দ করছে এষার সঙ্গে নাচতে? এষার উদ্ধত বুক, আই লাইনার আঁকা চোখ, প্লাগ করা ভুরু, স্যাগি হেয়ার। সোনিয়ার মনে হলো, কামুক যুবকের মতন রূপঙ্কর যেন দেখছে এষাকে। রূপ! সোনিয়া অপমানে মরে গেল যেন। ওর মনে হলো, রূপঙ্কর তাকে চাবুক মারছে। কিন্তু এমন কি অপরাধ করেছে ও? সাপুড়ের মতন রূপঙ্করকে নিয়ে তো ও খেলায়নি, এষারা যা করে থাকে। রূপঙ্করের কাছে ও বন্ধুত্ব চেয়েছে। সহজ সম্পর্কের সীমানায় ও চেয়েছে রূপঙ্করকে। সোনিয়া জীবনের জটিল ঘূর্ণাবর্তে তাকে টেনে আনতে চায়নি। আর ওর মনে হয়, সেটাই তো ভালো। ওর মতন করে রূপঙ্কর একথা ভাবতে পারলো না কেন?

আচ্ছা, এষারও কি ভাল লাগছে ওর সঙ্গে নাচতে? হয়তো লাগছে। আর এটাই তো রীতি। সোস্যালের বিশেষত্বই তো তাই। যখন যে নাচের পার্টনার হবে, তার সঙ্গে খুশি মনে নাচতে হবে। কোন বিশেষ একজনের মুখ মনে করে নাচতে এলে এখানে ঠকতে হবে। যেমন সোনিয়াও থমথমে মন নিয়ে নাচছে সোস্যালে। ওর চোখে একটা টোকা মারলেই ঝপ্ করে পড়বে দু' ফোঁটা জল। একরাশ জমাট কান্না ওর বুকে পাথরের মতন ভারী হয়ে আছে যেন। অবনটা বড্ড বোকা। ও বুঝতে পারছে না কিছু। ওর সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে ফেলে নাচছে

সোনিয়া। ওর মুখে শো-কেসের সাজানো পুতুলের হাসি। শুধু এটুকু পেয়েই খুশি অবন। ও উত্তেজিত হচ্ছে। ভাটনগরের উত্তাপ কি অবনকেও ছুঁয়ে যাচ্ছে? বুঝতে পারছে না সোনিয়া। অবনের তপ্ত ঠোঁট দুটো বোধহয় চঞ্চল হচ্ছে। ওর হাত এতো কাঁপছে কেন? এই অবস্থা তো হয়েছিল গতবার সোস্যালেও রূপঙ্করের।

পরিষ্কার মনে পড়ছে সোনিয়ার। এই বুদ্ধের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়েই রূপঙ্কর তাকে বলেছিল, আই উইশ উই কুড্ ড্যান্স লাইক দিস্ ফরেভার।

সোনিয়ার খুব হাসি পাচ্ছে এখন। ওর মনে হচ্ছে, রূপঙ্কর কি ওই একই কথা এষাকেও বলছে? লায়ার রূপঙ্কর, ট্রেচারাস রূপঙ্কর! বার্চহিলের নির্জন নগ্ন পাথরে বসে তাকে ভালবাসার কথা বলেছিল। আর এখন?··· সোনিয়া ভাবলো, কই আজ রূপঙ্করের চোখে সেই স্বীকৃতি?

সামান্য কাছে টানলো অবন ওকে। আবেগে বুজে এলো অবনের গলার স্বর। বললো, তুমি কি আমায় কিছু বলবে?

হাসলো সোনিয়া। বললো, ও নো। থ্যাঙ্ক গড্ দ্যাট আই অ্যাম্ রিয়েলি এনজয়িং।

রিয়েলি?—প্রজাপতির মতন নেচে উঠলো অবনের চোখ।

মার কথা মনে পড়লো সোনিয়ার। মিস্টার চৌধুরী, মার সেই মুগ্ধ ভক্তকে মা বোধহয় এমনিভাবেই প্রতারণা করেন? সোনিয়া জানে, মা এলোমেলোভাবে হাঁটতে হাঁটতে প্রায়ই চাঁদমারীর দিকে চলে যান। বাবার সঙ্গে দেখা করেন না, তবু। আসলে ওই চাঁদমারীর রাস্তাটা মার কাছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। যদিও ওখানে মার লাঞ্ছিত জীবনের অনেক ইতিহাস। যেখানে পড়ে রয়েছে মার আসল সত্তা। ম্যাল রোডে মিস্টার চৌধুরীর বাংলোয় যে মাকে সোনিয়া দেখে, সে ওর মা নয়। ওর মার

প্রেতাত্মা। এই তো আর একটু বাদেই বাড়ি ফিরে ও দেখবে সেই দৃশ্য। একটা পোষা স্প্যানিয়ালের মতো মা কেমন আদর খাচ্ছেন মিস্টার চৌধুরীর। ফোমের গদির ওপর বসে পা নাচাতে নাচাতে মিস্টার চৌধুরী কোন জার্নাল পড়ছেন, আর তাঁর পায়ের সঙ্গে লেপটে রয়েছেন মা। বসে বসে উল বুনছেন। মিস্টার চৌধুরীর উলঙ্গ হাত তাঁর পিঠের ওপর খেলা করে চলেছে।

ক্যামেরাম্যান ঘুরছে। ওদের ভাড়া করে আনা হয়েছে স্টুডিও থেকে। ঘন ঘন সাটার টিপছে ওরা ক্যামেরায়। হাসছে সোনিয়া। ও জানে, ক'দিন পরই ম্যালের সেই বিখ্যাত স্টুডিওর শো-কেসে এই হাসি দেখবে রূপঙ্কর। কিন্তু অবন বেচারী বুঝতে পারলো না ওর সেই হাসির কারণ।

ইউ আর সো সুইট।—বললো অবন, ইওর স্মাইল ইজ চার্মিং। তোমার হাসিটা কি সুন্দর। আই উইশ এভ্‌রিবডি ইন দিস্‌ ওয়ার্ল্ড কুড্‌ স্মাইল লাইক ইউ।

নাচে মন দিতে পারছে না সোনিয়া। ও বুঝতে পারছে, অবনকে ও ঠকাচ্ছে। তবু নাচে মন দিতে পারছে না সোনিয়া। ও এষার দিকে তাকালো একবার। কেন যেন মনে হল ওর, এষাও তার মতন অভিনয় করছে। ওর হয়তো ভাল লাগছে না রূপঙ্করের সঙ্গে নাচতে। এষাও কি কাল বলবে, আই ডোণ্ট লাইক রূপঙ্কর? আই ডিড্‌ নট এক্সপেক্ট রূপঙ্কর? অথচ ফাদার সিস্টাররা ওই নাচের প্রয়োজনীয়তা দেখেছিলেন অন্যভাবে। ছেলেমেয়ের ভেতরে মেলামেশার ব্যাপারে সহজ ভাব আসবে। এই নাচের সময় কোন বিশেষ ছেলে বা মেয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকবে না কারো। সবই তো জানে সোনিয়া। তবু ওর চোখ দুটো চুরি করে রূপঙ্করকেই দেখতে লাগলো। এ যেন এক নেশা। ও আবিষ্কার করলো, রূপঙ্করকে দেখার নেশা এই সোস্যালেই যেন শুরু হল। আজকেই যেন রূপঙ্কর ওর কাছে

বড় বেশী দুর্লভ হয়ে উঠলো। অথচ ও তো ইচ্ছে করেই কয়েক মাস ওর সঙ্গে দেখা-টেখা করেনি।

এম সি হঠাৎ ঘোষণা করলো, দিস্ ইজ এ ট্যাগ্ ড্যান্স।

খুশির ঝলকে নেচে উঠলো ওদের চোখ। সেই একদল ছেলেমেয়ে, ওরা যেন ফুলের বনে একরাশ মৌমাছি। মৌমাছির মতন গুঞ্জন করে উঠলো ওরা। রেকর্ডে বেজে উঠলো—

"উই হ্যাড জয় উই হ্যাড ফান,
উই হ্যাড সিজন্‌স ইন দা সান।"

কাকে যে ধন্যবাদ জানাবে সোনিয়া ভেবে পেল না। ট্যাগ্ ড্যান্স অর্থাৎ যার সঙ্গে খুশি সে তার সঙ্গে নাচতে পারে। সাধারণত ছেলেরাই ট্যাগ্ করে। মেয়েরা থাকে নীরব প্রতীক্ষায়। ইচ্ছে হলে মেয়েরাও পছন্দ মতন ছেলের সঙ্গে নাচতে পারে। কিন্তু ওরা তা করে না। যদি ঘোষণা হয়, দিস্ ইজ এ গার্লস ট্যাগ, তখন মেয়েরা তাদের নাচের পার্টনার খুঁজে নেয়। এক মুহূর্ত ভাবলো সোনিয়া। একটু বোধহয় অপেক্ষাও করলো। ভাবলো, রূপঙ্কর কি ট্যাগ্ করবে তাকে ?

কিন্তু কোথায় ? তার সেই প্রত্যাশিত মানুষ এলো না। রূপঙ্কর ট্যাগ্ করলো হেলেনাকে। সোনিয়ার সঙ্গী হয়ে এলো প্রসেনজিৎ। নাচ শুরু হল। এম সি-রাও নাচছে এখন। ওরা তো এই সেণ্ট পিটার স্কুলেরই ছেলে। ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে থেকেই ফাদার এম সি-র ভূমিকা দেন কাউকে কাউকে।

বুদ্ধের মূর্তিতে এখন স্নিগ্ধ সবুজ রঙ। যৌবনের প্রতীক সবুজ। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হাতে যেন শুভেচ্ছার বাণী। আজ যারা নাচছে এখানে, এটাই তাদের স্কুলের গণ্ডীর শেষ সোস্যাল। আর ক'দিন পরই ওরা চলে যাবে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণ পেরিয়ে পূর্ণ যৌবনের দিকে। স্কুলের সীমানা শেষ হবে। সামনেই সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষা। তারপরই তো কলেজ।

ওরা কেউ ডে স্কলার, কেউ বোর্ডার। বোর্ডাররা অর্থাৎ যারা হস্টেলবাসী, তারা কেউ এসেছে সুদূর আফ্রিকা থেকে, কেউ মালয়, কেউ বোম্বাই, গুজরাট। ডে স্কলাররা এই পার্বত্য শহরেরই বাসিন্দা। তারাও হয়তো চলে যাবে এই শৈলশিখর থেকে অন্য কোথাও। আরো ব্যাপকভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে। সামনেই ওদের বড় জগতের হাতছানি। তাই এই শেষ সোস্যালে ওরা প্রচুর হাসছে। মেজাজে নেচে চলেছে। ওদের একের সঙ্গে অন্যের আলাপ হচ্ছে। সেই আলাপ প্রলাপে গিয়ে ঠেকছে।

প্রসেনজিতের সঙ্গেও সোনিয়ার আলাপ হলো অবনের মতই। সেও তাকে প্রথমে নাম জিজ্ঞেস করলো। নাচের পার্টনার হিসেবে সোনিয়াকে পেয়ে তার খুশির কথা বললো। নাচতে নাচতে ভাঙা-ভাঙা গলায় দু-একটা দুর্বলতার কথাও জানালো। প্রসেনজিতের শ্যামলা গায়ের রঙ, নরম গালে কচি চাপা দাড়ি। বড় বড় একমাথা চুল। ওর ওই অগভীর চোখ দুটোয় যেন অপরিণত মনেরই ছাপ। গোলগাল ভরাট মুখখানা। উঠতি বয়েসের রঙ ওর মনেও। অবনের চেয়েও প্রসেনজিৎ যেন বেশী প্রগল্‌ভ। ও তাই বড় তাড়াতাড়িই বলে ফেললো, উইল ইউ রিমেমবার মী ফরেভার? তুমি আমায় চিরদিন মনে রাখবে?

চিরদিন? হাসির রেখা পড়লো সোনিয়ার মুখে। এর দাবী যে আরো···। সোনিয়া অবাক বিস্ময়ে বললো, হাউ ফানি! এতো অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি কি কাউকে দেওয়া যায়? প্রসেনজিতের হাতের নরম মুঠোয় এখনো সাবালকত্বের চিহ্ন ফোটেনি। ওর চোখ-ভরা পিপাসা। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলো সোনিয়ার মুখের দিকে। বললো, হোয়াই নট?

একরাশ কৌতুক সোনিয়ার চোখে। ও একটু হেসে বললো, হাউ মাচ ডু আই নো ইউ অ্যাণ্ড তুমিই বা আমার কতটুকু

জেনেছো ?

প্রসেনজিৎ থমকে গেল। বললো, আমি তোমায় জানতে চাই না। আমি তোমায় ভালবাসতে চাই।

ভালবাসা ?—হেসে উঠলো সোনিয়া। বললো, আই ডোণ্ট নো হোয়াট ইজ ভালবাসা।

প্রসেনজিৎ আবেগকম্পিত গলায় বললো, ইউ উইল ফিল্ ইট।

কোন উত্তরই দিল না সোনিয়া। সেদিন বাবাকে দেখেছিল ও বার্চহিলের দিকে। পাইন গাছের নীচে একটা বড় পাথরের ওপর বসেছিলেন বাবা। সামনেই কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গ। বরফের ওপর রোদ পড়েছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার স্পর্ধিত শৃঙ্গ দর্পিত রাজার মুকুটের মতন ঝিকঝিক করে উঠেছিল। এক মহিলাকে কোমর জড়িয়ে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বাবা বলছিলেন, তুমি আমায় মনে রেখো, তুমি তুমি।

সুন্দরী মহিলাদের প্রতি বাবার বরাবরই আসক্তি, একথা সোনিয়ার অজানা নয়। চাঁদমারীতে বাবার ওই অগোছালো ঘরে রঙ, তুলি, আর প্রচুর ছবির ভিড়ে, সোনিয়া একদিন আবিষ্কার করেছিল এক মহিলাকে, যিনি বাবার মডেল হয়েছিলেন। আজ পাথরের ওপর বসে-থাকা ওই মহিলার মুখের সঙ্গে সোনিয়া তাঁর সাদৃশ্য খুঁজে পেল। মহিলাটি কিছু বললেন বলে মনে হলো না ওর। ওঁর বসে থাকার ভঙ্গি বড় নিস্পৃহ, উদাসীন। মার জন্যে বুকটা যেন কেমন করে উঠেছিল সোনিয়ার। ওর মনে হয়েছিল, একথা যদি তার মাকে একবার শোনাতেন বাবা! ওই আধ-পাগলা শিল্পী মানুষটির জন্যে তার মার অনেক কিছুই খোয়া গিয়েছিল। সম্মান, মর্যাদা, ভালবাসা। খুব বেশীক্ষণ ওই দৃশ্য দেখতে পারেনি সোনিয়া। ক্ষোভে, লজ্জায়, বেদনায় ও পালিয়ে এসেছিল

সোনিয়ার এখন মনে হলো, ভালবাসা কেউ পায় না। ভালবাসা অনবরত ছুটে ছুটে বেড়ায়—এক থেকে দুইয়ে, দুই থেকে তিন-এ, তিন থেকে চার-এ। এ যেন আশ্চর্য এক বল। যে বল চিরদিনই থাকে মানুষের নাগালের বাইরে। তার মায়ের সেই বল, সেই ভালবাসার বলটাকেই কি বাবা সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ওই মহিলার কাছে? যেমন সোনিয়ার সেই ভালবাসার বল গোল দিয়ে ঠেলে দিল রূপঙ্কর!

ওর মনে হলো, ওরা কেউই ভালবাসা নিতে জানে না। ওরা একের ভালবাসা অন্যকে শুধু ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেয়। রূপঙ্কর, সোনিয়া, মা, বাবা যারা তৃপ্ত হবে না কোনদিনই। যারা চিরদিন ধরে খুঁজে যাবে তাদের প্রত্যাশিত ভালবাসার মানুষকে।

তার মা তো সুখী হননি। সোনিয়া জানে, মা যে আজও ভালবাসেন বাবাকে। বাবাকে ছেড়ে আসায় মার মনে অনুশোচনা আছে, আছে যন্ত্রণার দাহ। তাই মা এখনো বাবার জন্যে গির্জায় প্রার্থনা করেন। ছুটে যান চাঁদমারীর দিকে। মিস্টার চৌধুরীর অত টাকা-পয়সা কিছুই তো ভোলাতে পারেনি মাকে, মার সেই পুরনো মনটাকে। যে-মন এখনো সোনিয়ার বাবার মঙ্গল চায়, তাঁর জন্যে গোপনে চোখের জল ফেলে। এর নামই হয়তো ভালবাসা। প্রসেনজিতের কি ক্ষমতা আছে এই ভালবাসার?

সোনিয়া মাঝে মাঝে ভাবে, মার কি ইচ্ছে হয় বাবার সঙ্গে তাঁর একবার দেখা হোক? হয়তো হয়। কিন্তু মা তবু দেখা করেন না। বড় অহঙ্কারী তার মা। এই অহঙ্কার ভালবাসার অহঙ্কার। প্রসেনজিতেরা কি এটা অনুভব করতে পারবে?

কনসার্ট হলে ঢুকলেন ফাদার টমাস। পরনে সাদা আলখেল্লা, মুখে সাদা দাড়ি। ফাদারের চোখ যেন দেওয়ালের ওই যীশু। হেসে ফাদার বললেন, আই হোপ ইউ অল আর এনজয়িং ইওরসেলভ্স।

থ্যাঙ্ক ইউ ফাদার।—বললো কেউ কেউ। চলে গেলেন ফাদার।

হাই! রহমান হঠাৎ ট্যাগ করলো সোনিয়াকে। প্রসেনজিতের মুখে তখনো কথা। ওর শেষ করা হল না কথাটা। শ্যেনদৃষ্টিতে তাকালো প্রসেনজিত রহমানের দিকে।

ব্যাপারটা উপভোগ করলো সোনিয়া। ট্যাগ ড্যান্স এ-জন্যেই ওর এতো মজার লাগে। একজনের মনের মানুষকে আর একজন ট্যাগ করে নিয়ে যায়। প্রসেনজিৎ তখন ট্যাগ করলো রূপাকে। রূপা নাচছিল অবনের সঙ্গে। কিছুক্ষণ ধরেই সুযোগ খুঁজছিল ভাটনগর রূপাকে ট্যাগ করার জন্যে। কিন্তু পারছিল না। এবারেও না পেরে ও ফের নাচতে লাগলো জয়মিতার সঙ্গে। সোনিয়ার মনে হলো, ভাটনগরকে বোধ হয় ইচ্ছে করেই কেউ রূপার সঙ্গে নাচতে দিচ্ছে না। একজনের সঙ্গে সামান্য নাচার সঙ্গে সঙ্গেই রূপাকে আর একজন ট্যাগ করে নিচ্ছে। সোনিয়ার বেশ লাগছে এই খেলাটা। ও বারবার দেখলো ভাটনগরের গোবেচারী চেহারাটা। অবন ততক্ষণে চলে গেছে হেলেনার কাছে। হেলেনার সঙ্গে নাচছিল। হেলেনাকে যখন ট্যাগ করলো অবন, রূপঙ্কর তখন ফের ট্যাগ করলো এষাকে। অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো এষা। রূপঙ্করকে পেয়ে সে যেন অনেক টাকার লটারী জেতা বিজয়িনীর মতন গর্বিত চোখে তাকালো সোনিয়ার দিকে। চোখ ঘুরিয়ে নিল সোনিয়া। কাউকে ঈর্ষা করতে চায় না সোনিয়া। তবু এই মুহূর্তে এষাকে যেন ওর বড় অসহ্য লাগলো। আর রূপঙ্করকে মনে হলো, ও কি খুব বেশী বাড়াবাড়ি করছে না?

নতুন রেকর্ডে তখন বাজছে, লেট মী গেট্ টু নো ইউ।...

আহ্, ফাইন! রূপঙ্কর উচ্ছ্বসিতভাবে বলে ফেললো। অপলকে তাকালো সোনিয়া ওর দিকে। কিন্তু ওর সেই বোবা চোখের

যন্ত্রণা কি দেখলো রূপঙ্কর ? নিশ্চয় নয়।

বুদ্ধের মূর্তি থেকে তখন আলোর ফোকাস পড়ছে সোনিয়ার মুখে। নীল, সবুজ, লাল। রেকর্ডে মিউজিক চলছে। ওর মনে হচ্ছে, ওর বুকে যেন রক্তপাত হচ্ছে ; অসংখ্য আততায়ী ওর বুকে ছুরি চালিয়ে যাচ্ছে।

স্ন্যাক বারের দিকে এগিয়ে গেল রূপঙ্কর, এষা। নাচতে নাচতেই ওরা কামড় দিল স্যাণ্ডউইচে। রহমানের বাটারফ্লাই গোঁফের নীচে পুরু ঠোঁট। কানের দু' পাশে বড় বড় জুলপী। দাড়ি কামানো। পুরোপুরি সাবালক বলা যায় রহমানকে। চোখ দুটো উজ্জ্বল। আর সবার মতই তারও বড় চুল ঘাড় পর্যন্ত। পরনে বেলবটস কালো রঙের, ছিটের শার্ট। রহমান হেসে বললো, আই অ্যাম সো লাকি ছাট আই হ্যাভ গট এ চান্স টু ড্যান্স উইথ ইউ।

থ্যাঙ্ক ইউ।—বললো সোনিয়া।—সোনিয়ার হাতে হাত রেখে নাচতে নাচতে রহমান বললো, ডু ইউ নো মী? তুমি আমায় চেনো?

আর কারো সঙ্গে নতুন করে আলাপ জমানোর উৎসাহ নেই সোনিয়ার। তবু নাচের পার্টনারকে তো আনন্দ দিতে হবে? ভদ্রতাও তো রয়েছে। ও বললো, নো।

নো ? হাই !—রহমান আগ্রহের সঙ্গে বললো, খুব বেশী দিন আগের কথা নয়, মনে করে ছাখো···।—তাই তো ! ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল যেন কোথায় ? ঠিক মনে করতে পারলো না সোনিয়া। অপ্রস্তুতের হাসি হাসলো ও। রহমান বললো, সেই যে বার্নিংঘাটের দিকে একবার—

বার্নিংঘাট ? আই মীন শ্মশান ?

ইয়েস, ইয়েস।—উৎসাহিত হয়ে রহমান বললো, রূপঙ্করের সঙ্গে তুমি···।

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে।—হাসলো সোনিয়া। বললো, পৃথিবীটা

যে গোল একথাই মনে হয় বার বার…

রহমান ঝর ঝর করে হাসলো। সোনিয়াও যোগ দিল সে হাসিতে। রহমান বললো, তোমার তো দেখছি সার্প মেমারি! ইউ হ্যাভ টোটালি ফরগট্‌ন মী…।

বরফ পড়ছিল সেদিন। ডিসেম্বরের ভয়ংকর এক শীতের বিকেলে রূপঙ্করের সঙ্গে হাঁটছিল সোনিয়া। তখন সিজনারদের ভিড় নেই। ফাঁকা ম্যাল। শীতে উপেক্ষিতা এই শহরের বুকে ওভারকোট মাঙ্কিক্যাপে ঢাকা দু-একজন স্থানীয় লোকের মুখই দেখতে পেয়েছিল ওরা। তুষার-টুষারকে যারা পরোয়া করে না, সেই বেপরোয়া মানুষগুলোরও ঘরে ফেরার তাড়া। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে হাঁটছিল ওরা। শুধু ফেরার কোন গরজ ছিল না সোনিয়া, রূপঙ্করের। এলোমেলো পা ফেলছিল। ওরা উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলছিল। পেঁজা তুলোর মতন বরফে ঢেকেছিল বিশাল বার্চগাছের ভূতুড়ে মাথাগুলো। এই দৃশ্যই যেন হাতছানি দিয়ে ওদের ঘবছাড়া করেছিল। সেদিন প্রকৃতির মতন মানুষেরও মাথার টুপি থেকে গরম ট্রাউজার পর্যন্ত ভরে গিয়েছিল বরফের কুচিতে। শীতের ছুটি চলছিল। রূপঙ্কর বাড়ি যায়নি ছুটিতে। ডিসেম্বরের দার্জিলিঙ দেখার নেশা তার। ওদিকে হস্টেল বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব পিসির বাড়িতে থেকে গেল রূপঙ্কর। রূপঙ্করের কোটের ভেতর সোনিয়ার হাত, সোনিয়ার কোটে রূপঙ্করের। কথা বলতে বলতে ঘন হয়ে হাঁটছিল ওরা। দু'জনেরই পছন্দের লেখক আগাথা ক্রিস্টি। দু'জনেরই পছন্দের খেলোয়াড় ক্লাইভ লয়েড। নিজেদের কথা নিয়ে ওরা এতো ব্যস্ত ছিল যে, ম্যাল পেরিয়ে নীচের রাস্তা ধরলো। এক সময় ওরা আবিষ্কার করলো, ওরা স্টেশনের কাছে চলে এসেছে। হাঁটতে হাঁটতে ল্যাডেন লা রোড ধরে সোজা স্টেশন। রূপঙ্কর বললো হঠাৎ, আই লাইক টু গো টু দা বার্নিংঘাট সোনিয়া!

বার্নিংঘাট!—চমকে উঠেছিল সোনিয়া, তোমার মাথায় এতোও ঘোরে?

রূপঙ্কর বললো, দ্যাট ইজ এ ভেরী নাইস্ প্লেস্…মানুষের এনড্ এখানে।

খিল খিল করে হেসে উঠলো সোনিয়া। বললো, উই স্যাল লিভ ফর মেনি ইয়ারস মোর, রূপঙ্কর। আমরা কিন্তু এখনো অনেকদিন বাঁচবো।

তবু রূপঙ্করের আশ্চর্য জেদ। গুড্ডি রোড ধরে ওরা স্টেশনের নীচে নামতে লাগলো। এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ওরা ক্রমেই খাদের গভীরে নেমে গেল। অনেক নীচে শ্মশান। যাবার পথেই দেখা হলো রহমানের সঙ্গে। রূপঙ্কর বললো, রহমান! তোমারও কি শ্মশান-প্রীতি আছে?

রহমান বললো, একদিন তো যেতেই হবে ভাই শ্মশানে না হলেও গোরস্থানে, প্রীতি না রেখে উপায় কি বলো?

এরা দু'জনেই কি সাংঘাতিক! সোনিয়ার সেদিন ভাল লাগেনি রূপঙ্করের এই খেয়াল। ও কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কথাগুলো মনে হতেই ও রহমানকে বললো, আই স্যাল নেভার ফরগেট ইট, অ্যাণ্ড রূপঙ্কর, বিকজ্ তোমরা দারুণ অ্যাডভেঞ্চারাস্।—

সোনিয়ার কথা কেড়ে নিয়ে রহমান বললো, নট্ অ্যাডভেঞ্চারাস্ বাট ফিলোজফার। তারপর হাও ডু ইউ ডু? কেমন আছো বলো?

ভেরী ব্যাড্।

হোয়াই?

জানি না।

রহমান বললো, তুমি রূপঙ্করের খবর কিছু রাখো?

সোনিয়া অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। ওর নাচের স্টেপ ভুল হলো। রহমান বললো, ইয়া!

সোনিয়া বললো, সরি। হ্যাঁ, কি বলছিলে রূপঙ্করের খবর? —সোনিয়ার চোখ হাসলো। বললো, খবর মানে? ও তো আমার সামনেই একটা আস্ত খবর হয়ে ঘুরছে।

হাসলো রহমান। বললো, হি ইজ এ ভেরী ইনটারেস্টিঙ ফেলো। হি হ্যাজ সো ম্যানি অ্যাডমায়ারার্স, বাট হি অন্‌লি লাইক্‌স ইউ।

ভুরু কুঁচকে সোনিয়া বললো, অ্যাম আই ছাট লাকি?— ওর কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর।

ও আজকাল বারে যায় মাঝে মাঝে।

বার? ভালই তো।

হি স্পেনডিং স্লিপলেশ নাইটস্‌।

সে কি! আমার জন্যে? হেসে উঠলো সোনিয়া। বললো, হোয়াই ডোণ্ট ইউ টেল হিম টু টেক স্লিপিং পিলস্‌? ওকে স্লিপিং পিল খেতে বলছো না কেন!

রহমান হাসতে লাগলো।

কড়কড় করে মেঘ ডাকছে। নাচের আসর এখন সরগরম। রূপঙ্করের দিকে তাকালো সোনিয়া। ও এখনো নাচছে এষার সঙ্গে। হেসে হেসে কি যেন বলছে রূপঙ্কর। এষাও হাসছে। সোনিয়ার মনে হলো, আরো কিছু সময় ধরে ওরা নেচে যাবে। একটার পর একটা রেকর্ড বেজে যাবে। কখনো ঈঙ্গেল বারটের গান, কখনো নীল ডায়মণ্ডের। ওদের নাচের পার্টনার বদলাবে। ওরা নেশার মতন কথা বলে যাবে। কত ছেলেমেয়ের মনের আদান-প্রদান হবে। একে অন্যকে মনে রাখার প্রতিশ্রুতি দেবে। তারপর তাদের সেই স্বপ্নগুলো ম্যাল, ল্যাডেন্‌লা রোড ঘুরে শেষ পর্যন্ত শ্মশানে গিয়ে শেষ হবে। এই মুহূর্তে সোনিয়া ভাবলো, তারা শ্মশানে গিয়েছিল কেন? রূপঙ্কর কি চেয়েছিল, ওখানে গিয়েই শেষ হোক তার ভালবাসার দাহ? তার যন্ত্রণার

অবসান ? ভেরী সিরিয়াস্ বয়। ও এতদূর ভাবতে পারলো কি করে ?

তারপর আর কোনদিনই তো ও এলো না সোনিয়ার কাছে। দেখাও করলো না কখনো। সোনিয়াও অবশ্য দেখা করতে চেষ্টা করেনি। রূপঙ্করের সঙ্গে নিজেকে খুব বেশী জড়াতে চায়নি সোনিয়া। ওর তখন মনে হয়েছিল, ভালবাসা কখনো সুখের হয় না। এতে শুধু দুঃখই বেড়ে যায়। ও যে বুঝেছিল একথা ওর মা আর বাবার জীবন দেখে। কিন্তু রূপঙ্কর তো সোনিয়া নয়। সে এতো ভাবতে শেখেনি। সোনিয়া যে এই বয়েসেই দারুণ পাকা। সে ভালবাসার সংগ্রাম দেখেছে। তাই ভাল-বাসায় তার এতো ভয়। কিন্তু আজ যে হেরে যাচ্ছে সোনিয়া। রূপঙ্করকে ওর ভালবাসতে ইচ্ছে করছে।

এম সি বললো, বয়েজ, প্লিজ টেক ইওর পার্টনারস্ টু ডিনার।

ক্যামেরার ক্লিক্ শোনা গেল বার বার। সোনিয়া জানে, কোন ছবিতেই সে আর হাসবে না।

ডিনার টেবল ঘিরে বসলো ওরা। এষার পাশে রূপঙ্কর, রহমানের পাশে সোনিয়া। টেবলে সাজানো নানা খাবার। হ্যাম স্যাণ্ডউইচ, রাশিয়ান স্যালাড, ফ্রায়েড রাইস্, চিকেন কারি।—কিছুই ভাল লাগছে না সোনিয়ার। শুধু হট ডগ্ স নিলো। ওর ঠিক মুখোমুখি উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসেছে রূপঙ্কর। বড় অস্বস্তি হচ্ছে সোনিয়ার। রূপঙ্কর একবারও ওর দিকে তাকালো না। একি ওর অভিমান ? নাকি অপমানের প্রচেষ্টা ? বুঝতে পারলো না সোনিয়া।

সেদিন সেই শ্মশানের রূপঙ্করের সঙ্গে এই রূপঙ্করকে ও মেলাতে পারছে না। এতো তাড়াতাড়ি মানুষ কি বদলায় ?

চিতা জ্বলছিল। পাতলা অন্ধকার নেমে এসেছিল তখন শ্মশানে।

ঠাণ্ডাটা ভারী বরফের মতন ঠেসে ধরেছিল ওদের চারদিক থেকে। ডবল পুলওভারের ওপর কোট চাপিয়েও শীত যায় না। রূপঙ্করের মাথায় গরম টুপী, হাতে গ্লাভস। তবু চিতার আগুনে হাত সেঁকেছিল রূপঙ্কর। একটা কার্ডিগানের ওপরে কোট চাপিয়ে সোনিয়া দিব্যি হাসছিল। মাথায় বাঁধা সিল্কের রুমাল। কোথাও কোন জনমানব নেই। শুধু চিতা জ্বলছিল। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। সেই চিতার আগুনের লাল আভায় রূপঙ্কর দেখছিল সোনিয়াকে। বড় গভীর সেই চাহনি। ও যেন কি খুঁজছিল সোনিয়ার মুখে। মৃতের মুখ তখন পুড়ছে। সেই বীভৎস-মুখ আগুনের লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল সোনিয়া। কিন্তু রূপঙ্কর তবু নির্বাক। স্থির চোখে ও তখনো দেখছে সোনিয়াকে। কি দেখছো?—ভীত গলায় সোনিয়া বললো। রূপঙ্কর বললো, তোমাকে। সোনিয়া, দিস্ ইজ নট এ ম্যাটার অব জোক, রিয়েলি আই লাভ ইউ। প্লিজ গিভ মী ইওর ওয়ার্ড, ছাট ইউ উইল ওয়েট ফর মী।—তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে বলো?

সোনিয়াকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরলো রূপঙ্কর। পাখির মতন ছটফট করে উঠলো সোনিয়া রূপঙ্করের উত্তপ্ত বুকের মধ্যে। ও চীৎকার করে বললো, ইউ আর ম্যাড্! ম্যাড্ রূপঙ্কর! এই কথা বলার জন্যে এতো দূরে নিয়ে এলে আমায়?

হা হা করে হেসে উঠলো রূপঙ্কর। বললো, আই ডোণ্ট নো হোয়াই শ্মশান আমার এতো ভালো লাগে। শিউরে উঠলো সোনিয়া। ও যেন চিনতে পারছিল না রূপঙ্করকে। দূরে নেপালীদের বস্তিতে আলো জ্বলে উঠলো। পাহাড়ের ধাপে ধাপে আলোর মালা। আকাশে তারাদের মিছিল। সোনিয়া অবাক হয়ে দেখলো রূপঙ্করকে। ও বুঝতে পারলো না গ্লেনারিজ, সাঙগ্রিলাতে কিংবা জলাপাহাড়ে না গিয়ে রূপঙ্কর তাকে একথা

বলার জন্যে এই ভয়ংকর জায়গায় নিয়ে এলো কেন? নিজেকে খুব নিঃস্ব লাগছিল সোনিয়ার। কান্নায় ওর গলা বুজে আসছিল। ও থেমে থেমে বললো, ইউ সি উই আর স্ট্রেনজারস্। এখনো আমরা কেউ কাউকে জানি না রূপঙ্কর।

তুমি আমায় লাইক করো না?—আবেগে কাঁপছিল রূপঙ্করের গলা। যা উঠতি বয়েসের মাদকতায় ভরা। চোখ দুটো আশ্চর্য সুন্দর হয়ে জ্বলছিল। সোনিয়া কেমন ভয় পেয়ে গেল। রূপঙ্করের ওই চোখে ও দেখলো ওর বাবার চোখের প্রতিচ্ছবি। ওর মনে হলো, ওর বাবাও কি এই জিজ্ঞাসা করেছিলেন ওর মাকে? আর তাঁর সেই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ওর মা দেউলে হয়ে গিয়েছিলেন? রূপঙ্করের বুকের মধ্যে থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল সোনিয়া। খুব ঠাণ্ডা গলায় ও বললো, আই ওয়াণ্ট ইউ অন্‌লি অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড।

উঠে দাঁড়ালো রূপঙ্কর। খেলোয়াড়ের মতন বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ।

ডিনারের শেষে হালকা নাচ শুরু হলো আবার। সোনিয়ার এবারেও নাচের সঙ্গী হলো রহমান। নাচতে নাচতে ও এক সময় বললো, হাউ ডু ইউ লাইক ড্যান্সিং উইথ মী? কেমন লাগছে আমার সঙ্গে নাচতে?

চোখের কোণে হেসে, কান্না জড়ানো বিকৃত গলায় সোনিয়া বললো, ফাইন।

ফুর্তিতে রহমান তখন মশগুল। কনসার্ট হলের বাজনায় সে মুগ্ধ। রহমান খেয়ালই করলো না ভাল করে সোনিয়াকে। খুশী হয়ে ও বললো, থ্যাঙ্কস।

সোস্যাল শেষ হলো যখন, ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা বাজে। রেকর্ডের গান থেমে গেল। কনসার্ট হলে শুরু হলো কথার ভিড়। একের সঙ্গে অন্যের পরিচয় নেওয়া আর দেওয়ার পালা।

এখন ফিরে যাবে সেণ্ট মেরী স্কুলের মেয়েরা। সেণ্ট পিটার স্কুলের ছেলেরা পৌঁছে দেবে তাদের। বাইরে ল্যাণ্ডরোভার দাঁড়িয়ে। ডে-স্কলাররা বাড়ি ফিরে যাবে, বোর্ডাররা হস্টেলে। স্কুলের হেড বয় স্টেজে দাঁড়িয়ে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ ফর কামিং টু দা সোস্যাল। হোপ্ ইউ এনজয়েড ইওরসেলভ্স্।

মেয়েদের পক্ষ থেকে উঠে দাঁড়ালো এষা। বলল, থ্যাঙ্কস, উই এনজয়েড দ্যা সোস্যাল থরোলি। হোপ, উই মিট এগেইন্।

কনসার্ট হলে এলেন ফাদার টমাস, তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে। তাঁদের মুখে সার্থকতার হাসি। সোসাইটির উপযুক্ত ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা একে অন্যের কাছে সহজ হবে। তাদের মধ্যে থাকবে না কোন আড়ষ্টতা। পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের মেলামেশার ব্যাপারে ঘুচে যাবে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব।

সবার মুখেই হাসির রেখা পড়লো। শুধু সোনিয়া বিষণ্ণ। ও ভাবছিল, সত্যিই কি তাই? এই সোস্যালে এসে ওরা কি একের সঙ্গে অন্যে মিশে যেতে পারলো? ছেলেমেয়ের পার্থক্য কি বার বার ওদের মনের মধ্যে উঁকি মেরে গেল না? এই ড্যান্সফ্লোরে নাচতে এসে ওরা যে যৌবনকে চিনে গেল। ওদের কাঁচা মনের নরম জমিতে ভালবাসার প্রথম বীজ পড়লো। বুদ্ধের মূর্তিতে তখনো রহস্যময় আলো।

বাইরে ঝড়বৃষ্টির দাপাদাপি। অন্যমনস্ক সোনিয়া দেখলো রূপঙ্করকে। এমনি করে এর আগে ও আর কখনো দেখেনি ওকে। সোনিয়ার চোখে যেন আজ ভালবাসার রোশনাই। সেই মুহূর্তে ওর কেন যেন মাকে মনে পড়তে লাগলো। বাবাকে…। ওর চোখের সামনে বার বার এসে দাঁড়ালো, ছেঁড়া তালি মারা, ঢোলা পাত্‌লুন-পরা এক মানুষ। যার খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রুক্ষ চুল। যার হাতে ইজেল ক্যানভাস।

দূরে কোথায় যেন বাজ পড়লো। সোনিয়া ভাবলো, তার

মা কি আজও ছুটে গেছেন চাঁদমারীর দিকে ?

মাথায় টুপি, গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে হই হই করে এগিয়ে গেল ওরা, ল্যাণ্ডরোভারের দিকে। মুহূর্তে চোখাচোখি হয়ে গেল সোনিয়ার রূপঙ্করের সঙ্গে। ওর চোখে চোখ পড়তেই রূপঙ্কর হাত নেড়ে বললো, বাই সোনিয়া···।

সোনিয়ার চোখ জ্বালা করে উঠলো। তাকে কি কনসোলেশন দিয়ে গেল রূপঙ্কর ? হাত নেড়ে সোনিয়াও বললো, বাই রূপ···রক্ত ঝরে পড়ছে তখন সোনিয়ার বুকে। ও বুঝতে পারলো না এর শেষ কোথায় ! যীশুর মূর্তির দিকে তাকিয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলো বুকে সোনিয়া। বললো, আমেন। শান্তি।

ট্যাক্সি থামলো। সুগত আগে নামলো। ও নেমেই ট্যাক্সির দরজা খুলে দাঁড়ালো। তারপর নামলো মালিনী। মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললো সুগত। এতক্ষণ চোখ বুলোতে বুলোতে এসেছে সুগত প্রতিটি সাইনবোর্ডে। ডক্টর ঘোষের লিখে দেওয়া সেন্ট্রাল নার্সিং হোম খুঁজে পেতে দেরী হয়নি মোটেই। সুইংডোর ঠেলে করিডোরে ঢুকলো দু'জনে। মালিনীর হাতটা ধরেই থাকলো সুগত। মালিনীর তখন মাথা ঘুরছে। গা বমি-বমি করছে। আসবার আগে টুপুসটা দমাদম লাথি মারছিল কোলাপসিবল গেটে। অনেকদিনের পুরনো কাজ-করা লোক মংরা ছুটে এলো। কিন্তু টুপুসের গায়ের জোরের কাছে মংরা পেরে উঠলো না। অতটুকুন ছেলে। মাত্র চারে পড়েছে। এখনই এই। সাঁওতাল মংরার গায়ের শক্তিও তার কাছে হার মানলো। মংরা পড়ে গেল। সে ফের উঠলো। টুপুসকে জাপটে ধরলো মংরা। তারপর কষে একটা ঘুঁষি লাগালো। টুপুসটা পড়ে গেল। উপায় নেই। নইলে ওকে তো কিছুতেই বাগে আনা যেত না। টুপুসটা ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছিল। ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়েও অপলকে তাকিয়ে থাকলো মালিনী। বাড়ির চাকর ছেলেকে মারলো। সে দৃশ্যও দেখতে হলো মাকে। এ নির্দেশ যে তাদেরই দেওয়া। নইলে টুপুসটা এক্ষুনি একটা প্রলয় কাণ্ড বাধাতো। কোলাপসিবল গেটে মাথা ঠুকে রক্তারক্তি করতো।

এই শীতেও কুলকুল করে ঘামছে মালিনী। সুগতর হাতের

মুঠোয় ঘামতে লাগলো ওর হাত। স্পীডটাকে এক করে ফ্যানের সুইচটা টিপে দিল সুগত। নার্সিং হোমের আয়া একবার উঁকি মেরে গেল। পান চিবুতে চিবুতে সে বোধ হয় একটু হাসলো। সুগতর ঠোঁটে এখনও সেই সিগারেট। পানের দোকানের জ্বলন্ত দড়ি থেকে যা সে ধরিয়েছিল এই কিছু সময় আগে। সুগত বললো, বসো।

ওয়েটিং রুমের একটা চেয়ারে ও বসিয়ে দিল মালিনীকে। নিজেও বসে পড়লো আর একটা চেয়ারে। ডক্টর সিংয়ের চেম্বারে চিঠি চলে গেছে আগেই। অতএব চুপচাপ বসে বসে সিগারেট টেনে চললো সুগত। সব ব্যাপারেই ও একটু ধীর-স্থির। তাড়াহুড়ো করে কাজ করার পক্ষপাতী ও নয়। মালিনীকে এই নার্সিং হোমে আনার ব্যাপারটাতেও সেই দেরীই হলো। প্রায় তিন মাস পেরিয়ে গেল। সুগত ভাবছিল। কাল টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার সময়ই তো ডক্টর সিং রীতিমত ধমকেছিলেন। মশাই, অ্যাদ্দিন কচ্ছিলেন কি? আরো আগেই আসা উচিত ছিল আপনার।

ডক্টর ঘোষের চিঠি হয়ত এতক্ষণে পড়ছেন ডক্টর সিং। সুগত ভাবলো, ডক্টর ঘোষ তো আগাগোড়াই লিখে দিয়েছেন মালিনীর কেসটা। মালিনীর বর্তমান শারীরিক অবস্থা। তবু সুগত আরও একটু বলে দেবে ডক্টর সিংকে। তার স্ত্রী বেশী রকম নার্ভাস। বড্ড সেন্টিমেন্টালও যে।

মালিনী তাকালো টানা চোখে। ওর চোখ দুটো ক্লান্ত। অসম্ভব করুণ।

সুগত দেখলো এক পলক। ও বললো, মাথা ঘুরছে?

হুঁ।

সুগত বললো, ঘাবড়াও মৎ। হাম হ্যায়।

শুকনো ঠোঁটে মালিনী একটু হাসলো। পুরুষালী ঢঙে বেশ

জোরের সঙ্গে হাসলো সুগত। যদিও ওর বুকের মধ্যেটা তখন দারুণ লাফাচ্ছিল। ও ভেতরে ভেতরে ভয় পাচ্ছিল। মালিনীর হার্টের অবস্থা খারাপ। ও ভাবলো, মালিনী যদি আর না ফেরে। এমন তো কতই হয়, অপারেশন টেবলে এসেই সব শেষ। সুগতর তাই খুব একটা ইচ্ছে ছিল না অপারেশনের। অথচ না করেও উপায় নেই। শেষকালে মালিনী যদি আরেকটি টুপুসকে জন্ম দিয়ে ফেলে। আরেকটি বিকৃত শিশুর বোঝা বয়ে বেড়ানো। কি সাংঘাতিক। সুগতর সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সাপের মতন ফণা ধরলো যেন। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ভয়ের শিহরণ খেলে গেল। ও অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলো।

ওয়েটিং রুমের দেওয়ালে দেওয়ালে নানা ধরনের বাচ্চার ছবি। ওরা যেন বেবীফুডের বিজ্ঞাপনের মতন হাসছে। সুগত অনেকদিন এমনি কোন সুস্থ শিশুদের দেখতে ভুলে গেছে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় সে কখনো আর চিলড্রেন পার্কের দিকে তাকায় না। নিজের অক্ষমতার জ্বালা তাকে পুড়িয়ে মারে।

ও উঠে দাঁড়ালো। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো। দুশো টাকা দিতে হবে ডক্টর সিংকে। মাসের শেষ। ধার ছাড়া পথ নেই। তবু মালিনীর মুখে অন্তত হাসি ফুটুক। গত এক মাস ধরে ঘুমোয়নি মালিনী। সুগত ভাবলো, ওর সেই ভয়াবহ মানসিকতা থেকে ও রেহাই পাক। ও তাকালো মালিনীর দিকে। মালিনীকে তখন চুম্বকের মতন আকর্ষণ করছে ওই দেওয়াল-শিশুরা। মালিনীর ঠোঁটে অদ্ভুত হাসির রেখা। মালিনীর মনে পড়ছে কয়েক বছর আগের কথা। যখন সে কল্পনায় ছবি এঁকে যেত, সুন্দর একটা সাজানো বাড়ি, সেই বাড়ির মালিক একজন ভালবাসার লোক—তার স্বামী। ছোট্ট একটি সোনা। দেবশিশুর মতন যার স্বর্গীয় সুষমা। ভাঙা নিঃশ্বাস ফেললো মালিনী। ও ভাবলো, সাদা, কালো চামড়ায় কি যায় আসে।

শুধু টুপুসটা যদি একটু স্বাভাবিক হতো! ও বললো, এই?

বলো।—সুগত ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। মালিনী অল্প হাসলো! সুগতর মুখটা তখন ছাইয়ের মতন ফ্যাকাশে। মালিনী চুপ করে গেল। সুগত ওর চোখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললো, কি বলছো বল?—মালিনীর চোখের ভাষা পড়তে পারলো সুগত। ও জানে সে কি বলবে। তবুও জিজ্ঞাসার চোখে তাকালো সুগত। টুপুসের প্রসঙ্গে কিছু বলতে চেয়েছিল মালিনী। বলা হলো না। ওর আর ইচ্ছে হলো না আধমরা সুগতকে নতুন করে ঘা দিতে। দুষ্টুমির হাসি হাসলো মালিনী। ওর চরম অভিনয়ের চোখ দুটো বললো, আমায় একটা চুমু দেবে?

সুগত হেসে ফেললো। চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল সুগত। কেউ কোথাও নেই। মালিনীকে জাপটে ধরে ও একটা চুমু খেয়ে ফেললো। দস্যি! দস্যি! ডাকাত! খিল খিল করে হেসে উঠলো মালিনী। সুগত মসৃণভাবে আরেকবার চুমু খেলো। ওর মনে হলো সেই কয়েক বছর আগের মালিনী। গায়ে ল্যাভেণ্ডারের সেই বিচিত্র গন্ধ। সুগত যেন হেঁটে হেঁটে কয়েক বছর পেছিয়ে যাচ্ছিল, যখন তাদের মধ্যে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই ফানুসের মতন উড়ে গেল সেই অতীত স্বপ্ন। মালিনী বললো, কি দারুণ বাচ্চাগুলো দেখেছ?

ওই দেওয়াল-শিশুরা ক্রমাগত টানছিল মালিনীকে। সুগত ছিটকে সরে গেল। তার হাতের মুঠোয় তখনো ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ। সুগত অবাক হয়ে দেখলো, মালিনী আবার মা হয়ে উঠেছে। তার চোখে-মুখে মাতৃত্বের ছাপ। মধুর রসের এই বাৎসল্যের পরিণতি সুগতকে রীতিমত চাবুক মারতে লাগলো। ও রুক্ষ কঠিন গলায় বললো, তাতে তোমার আমার কি যায় আসে?

কিছুই নয়। তাই বলে সুন্দরকে দেখবো না?—মালিনী

বললো। একটা ধারালো উত্তর এসে আটকে গেল সুগতর জিভে, লোভী! কিন্তু বললো না। মালিনীর বর্তমান শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে ও থেমে গেল। সুগতর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে মালিনী বললো, এই, মনে আছে তোমার? টুপুস হবার আগের কথা? এমনিভাবেই তোমার সঙ্গে গিয়ে বসতুম নার্সিং হোমে। সুন্দরকে ভালবাসতুম তাই না? শুধু আমি কেন, তুমিও তো।—মালিনী হাসতে হাসতে বললো। হাসিটা ব্যঙ্গের না কান্নার সুগত বুঝতে পারলো না। মালিনী বললো, প্রতারক।—সুগত বললো, কে?

মালিনী প্রথমে বললো, জানি না। তার পর বললো, আমাদের আশাবাদী মন। আচ্ছা, মঙ্গোলিয়ান বেবী কেন হয় বল তো?

সুগত কোন জবাব দিল না। একমনে সিগারেট টেনে চললো। ঘরের মধ্যে অসম্ভব স্তব্ধতা। শুধু দেওয়াল ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ। ওরা দু'জনেই তাকিয়ে থাকলো দেওয়াল-শিশুদের দিকে। টুপুসটা কেন এদের মতন হলো না, তা যে সুগতরই জানা নেই।

ব্যস্ত পায়ে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর সিং। সুগত মালিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ডক্টর ঘোষের চিঠি পড়েছি। ডোণ্ট ওয়ারি। জাস্ট এ মিনিট প্লিজ।

তেমনি ব্যস্তভাবেই আবার চলে গেলেন তিনি। মালিনী ভাবলো, আর কয়েক মুহূর্ত পরেই সব শেষ। একটা সুন্দর সম্ভাবনাকে তারা নষ্ট করে দেবে। হতে পারে এও তো সুন্দর। হয়তো সে হতো না টুপুসের মতন। সুগত ভাবলো, ফালতু দুশোটা টাকা জলে দেওয়া। বিবাহিতাদের অ্যাবোরসনের ব্যাপারটা আইনত সিদ্ধ হয়েছে। অথচ নার্সিং হোমে শুধু শুধু এতগুলো টাকা। তবু সরকারী হাসপাতালে যাবার সাহস ওর নেই। নানা প্রশ্ন, নানা সমালোচনা। তার চেয়ে এই ভালো।

কাকপক্ষীও টের পাবে না। দুশো টাকা দিলেই খালাস। মালিনী আবার ঝঞ্ঝাটমুক্ত হবে, এটা ভাবতেই তার ভাল লাগলো।

রাস্তায় ট্রাম বাসের আওয়াজ। ভবানীপুর এখন সরগরম। কলকাতা সহরের অগণিত মানুষের ব্যস্ত পায়ের আনাগোনা ফুটপাথে। হকারদের চিৎকার। নার্সিং হোমের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো মালিনী। এক সময় এই রাস্তাটা দিয়ে সে রোজ কলেজ যেতো। এই নার্সিং হোমটা কতবার চোখে পড়েছে। ও খেয়াল করেনি। সেদিন ও ছিল খোলা আকাশের পাখি। যার কোন বন্ধনই ছিল না স্বামীর কাছে, সন্তানের কাছে। হোক বিকৃত, তবু তো সে সন্তান। আসবার আগে টুপুসটা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আই গো মামি, আই গো মামি। টুপুস গো ট্যাক্সি, টুপুস গো ট্যাক্সি।—মংরাটা হয়ত অল্পেই রেহাই দেয়নি ওকে। মালিনী যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, মংরার অকথ্য মার। এ তো শুধু একদিনের ব্যাপার নয়, এ যে রোজকার কথা। প্রতিদিনই এই নাটক চলছে তাদের বাড়িতে। ঘরের একটি জিনিস ঠিক নেই। ফ্রিজ থেকে শুরু করে টাইমপিস পর্যন্ত সব ভেঙে তছনছ করছে টুপুস। বুদ্ধি যে নেই তা নয়। ওই ছেলেই তো স্কুলেও যায়। যদিও বয়েসের তুলনায় সে দু' ক্লাস নিচুতেই পড়ে। যেটা তাকে শিখিয়ে দেওয়া যায় সেটা সে বলতে পারে। আর যে কথা তাকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না, সে কথা বুদ্ধি খরচ করে শেখার ক্ষমতা তার নেই। বাবা-মায়ের ইংরিজী ফাদার-মাদার বলবে। কিন্তু একটু ঘুরিয়ে পেরেন্ট শব্দটা জিজ্ঞেস করলেই ও তখন বোকা বনে যাবে। তবুও যাই হোক, পড়ছে তো? মালিনী যেন মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিল। কিন্তু ওর ধরন-ধারণ যে বড় অস্বাভাবিক। কেমন যেন পাগলের মত। ওকে দিয়ে স্বাভাবিক কিছু করানো যাবে না। অনেক বড় বড় ডাক্তারদের তাই তো অভিমত। মালিনী আরেকবার স্বগতোক্তি করলো

যেন, ও কেন সুন্দর হলো না? স্বাভাবিক হলো না? ওর বুকের মধ্যে আবার হাহাকার করে উঠলো। চোখে জল নেই। একটা অসহ্য বোবা কান্না গুমরে মরতে লাগলো ওর বুকের মধ্যে। ও বার বার বলতে লাগলো, টুপুস! তোর জন্যেই তো আজ আমায় এখানে আসতে হলো। তুই আমায় ভয় পাইয়ে দিলি টুপুস। তোর জন্যেই তো আমি আরেকটা স্বাভাবিক বাচ্চার মা হবার সাধ হারিয়ে ফেলছি।—মালিনী প্রলাপ বকার মতন করে বলতে লাগলো। কেউ নেই সেই ঝুল বারান্দায়। নার্সিং হোমের ঝুল বারান্দায় তখন পাখিদের হাট বসে গেছে। চড়ুই পাখির খড়কুটোয় ঘেরা বাসায়। সেখানে সোনালী রোদ্দুরের লুকোচুরি। কিন্তু ওদের দিকে ফিরেও তাকালো না মালিনী। ও ভাবলো, এই পাখিদের মুক্তির আনন্দে তার কি লাভ? সামনেই টিউটোরিয়াল হোম। ওইখানেই তো কয়েক বছর আগে সে পড়তে আসতো। তখন সেও ছিল অমনি একটা পাখি। কিন্তু আজ!

মালিনী প্রথমে এই অ্যাবোরসনের পক্ষপাতী ছিল না। ও বলেছিল, না না। এটা পাপ।

কিসের পাপ? পাগল!—সুগত হেসে অভয় দিল। ও বললো, আজকাল তো এটা একটা জলভাতের মতন ব্যাপার। কত মেয়ে করছে। তা ছাড়া, সুগত বলেছিল, তোমার কেসটা অন্য। একটা জাস্টিফিকেশন আছে। যদি আবার একটা মঙ্গোলিয়ান বেবি···।—তুমি থামো। ওর কথার মাঝখানেই চেঁচিয়ে উঠেছিল মালিনী। সুগত বললো, রাগ করছ? তুমি বুঝতে পাচ্ছো না, আরেকটি বিকৃত শিশুকে পৃথিবীতে টেনে এনে তার জীবন অন্ধকারময় করে দেবার চেয়ে তাকে নষ্ট করে দেওয়াই ভালো।

আবার সেই বমি-বমি ভাব। মাথা ঘুরছে। মালিনীর পেটের

মধ্যে পাক দিচ্ছে। ও অস্ফুটে বললো, আহ্।—সুগত চকিতে তাকালো। দ্রুত বেরিয়ে এসে বললো, কি গো, খুব কষ্ট হচ্ছে? নার্ভাস হবে না মোটেই।—সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ঝুল বারান্দা থেকে ছুঁড়ে নীচে ফেলে দিল সুগত। ও বললো, এতো স্মার্ট তুমি, অথচ এই একটা সামান্য ব্যাপারে।...তুমি ভাব তো, সুগত ওর পিঠে একটু হাত বুলিয়ে বললো, কি রকম একটা চিন্তা থেকে তুমি মুক্তি পেতে চলেছো?

বোবা চাউনি ছুঁড়লো মালিনী। কিছু বললো না। ওর চোখের ধাব সুগতকে থামিয়ে দিল। কিছু সময় চুপ করে থেকে সুগত ফের বললো, তোমার ফ্রি হতে ভাল লাগছে না বল? সেই আমরা কেমন ফিরে যাবো আগের জীবনে। বোটানিক্যাল গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া। সামনের মাসেই তো বম্বে যাবো। তোমায় বম্বের জুহুতে নিয়ে যাবো।

ছাই! ছাই! মালিনী অনেক যন্ত্রণার মধ্যেও ঠোঁট উল্‌টে বললো, ওসব লোভ আর আমায় দেখিও না। তোমার দৌড় আমি জানি। বম্বের জুহু থেকে শেষ পর্যন্ত ডায়মণ্ডহারবার। —মালিনী বললো, মনে করে দ্যাখো তো, গত কয়েক বছরের মধ্যে তুমি আমায় কোথাও নিয়ে গেছ কি না?

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললো সুগত। ও ছোট্ট মেয়েকে ভোলানোর মতন করে বললো, নেব, নেব, টুপুসটা ছোট্ট ছিল বলেই তো পারিনি। মালিনী কাটাকাটাভাবে বললো, ছোট্ট নয়, বলো, অ্যাবনরম্যাল।

ওর সে কথা গ্রাহ্য না করে সুগত বললো, তাতে কি?— যদিও ওর মুখে একটা কথা এসে আটকে যাচ্ছিল, দোষটা আমার নয়, তোমার। তুমিই তো বেরোওনি টুপুসের জন্যে। ইচ্ছে করলেই তো তুমি যেতে পারতে মংরার কাছে ওকে রেখে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই দেখতাম, তোমার থমথমে মুখ, চোখ-

ভরা জল। কোথায় গেল তোমার সেই হাসি, সেই তপ্ত যৌবন! টুপুসের জন্ম তোমার আমার জীবনটাকে তছনছ করে দিল।

ডক্টর সিং এসে বললেন, আসুন, সব রেডি।

মালিনীর বুকটা হঠাৎ ধড়াস করে উঠলো। জ্বরো রুগীর মত জিভের স্বাদ। গলা শুকিয়ে কাঠ। ও ভ্যানিটি ব্যাগটা এগিয়ে দিল সুগতকে। আয়া বললো, ঘড়ি, আংটি এ-সব খুলে আসুন।

মালিনী কাঁপা কাঁপা গলায় সুগতকে বললো, এই, তুমি থাকবে তো?

কেন, আমায় কি তুমি এতই হৃদয়হীন মনে করো?—সুগত হেসে অভয় দিল।

বিরাট একটা হলঘর। সেই ঘর অপারেশন থিয়েটার। অপারেশন টেবিলে মালিনীকে শুইয়ে দিল নার্স। চারদিকে হাজার পাওয়ারের আলো। প্রৌঢ় ডক্টর সিং হাসি মুখে ঘরে এসে ঢুকলেন। মালিনীকে বললেন, কি, ভয় করছে?

কই, না তো!

ডক্টর সিং বললেন, আপনার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে আপনার ভয় করছে।

স্বীকারোক্তির হাসি হাসলো মালিনী। ডক্টর সিং বললেন, কোন ভয় নেই। কয়েক মিনিটের ব্যাপার। আপনার আগে, এই তো মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে, একজনকে যেতে দেখলেন না? আপনার সামনে দিয়েই তো তিনি এসেছিলেন।

মালিনীর মনে পড়লো, স্থূলকায় দীর্ঘ চেহারার একটি মেয়েকে। কিন্তু মেয়েটির তুলনায় তার স্বামীটিকে যথেষ্ট বয়স্ক বলে মনে হয়েছিল। মালিনী ভাবলো, তিনি কি ওর স্বামী? মেয়েটির সিঁথিটা, যতদূর মনে পড়ে, ও তো সাদাই দেখেছিল। তবে কি খৃষ্টান? না মুসলমান? নাকি কুমারী? এটা হয়তো ওর অবৈধ কোন ব্যাপার ছিল।

ডক্টর সিং বললেন, মনে সাহস আনুন, সাহস আনুন। এটা তো একটা মাইনর ব্যাপার। এ রকম কেস তো রোজই হচ্ছে। চারটে পাঁচটা চলছেই। ডক্টর সিং গায়ে অ্যাপ্রোন চাপাতে বললেন।

মালিনীর মনে পড়ে গেল, টুপুস হবার আগের কথা। সেদিনও তাকে শুতে হয়েছিল কোন এক নার্সিং হোমে। তবে কোন অপারেশন টেবিলে নয়। লেবার রুমের লেবার টেবিলে। সেদিন সে চোরের মতন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেনি। শাশুড়ী নিজে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়েছিলেন নার্সিং হোমের দরজায়। কিন্তু আজ শাশুড়ী যখন জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছো, মলি ?

ও নির্বিকারভাবে বলে গেল, ওর এক বন্ধুর বাড়ি, মা। সারাদিনের প্রোগ্রাম।

শাশুড়ী হয়তো একটু অবাকই হলেন। দীর্ঘদিনের মধ্যে এ ধরনের কথা তাঁর ছেলের বউ তাঁকে শোনায়নি কিনা। টুপুসের জন্যে ইদানীং বাপের বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করেছিল মালিনী। মা, বাবা তো নেই। ভাইয়েদের বউরা এসে গেছে। তারা এই অ্যাবনরম্যাল ছেলেটির বেয়াড়াপনা সহ্য করবে কেন ?

শাশুড়ী বললেন, ভালই তো। এমনি মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়। যদিও তিনি আজকাল প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, মাথা-ফাতা ঘোরে কেন তোমার ? আবার কিছু নয় তো ?

মালিনী স্রেফ অস্বীকার করে যেতো। বলতো, কি যে বলেন মা, একেই তো ওই অ্যাবনরম্যাল ছেলে, তারপর আবার ! অত শখ আমার নেই।

ও অ্যাবনরম্যাল বলেই তো, তোমার আবার শখের প্রয়োজন। —শাশুড়ী আস্তে আস্তে বলতেন। মালিনী মনে মনে বলতো, ওই করে আবার মরি আর কি ! তারপর ঝামেলাটা সইবে কে ! তুমি তো বাপু দিনরাত ঠাকুরঘরে পড়ে থাকো। তারপর

যদি আবার একটি অস্বাভাবিক কিছু হয়, তখন স্রেফ বলে বসবে, বউয়েরই দোষ। বউয়ের দোষেই তো এই হচ্ছে। আমার ছেলের যেমন কপাল!

শাশুড়ীর চোখে আজও ছিল সন্দেহের ছায়া। তিনি কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়েই ঠাকুরঘরে ঢুকে গেলেন। সুগত তাড়া দিল, চলে এসো, চলে এসো। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুগত বললো, মা কি মনে করলেন না করলেন, তা নিয়ে আর তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার প্রবলেম তো আর মা বুঝবেন না!

ডক্টর সিং বললেন, আপনি টেবিলের ঠিক মাঝখানটায় আসুন মিসেস চৌধুরী।

মালিনী চোখ বুজলো।...টুপুস হবার সময় যখন নার্সিং হোমে পৌঁছে দিলেন শাশুড়ী, তখন অতো ব্যথার মধ্যেও কি একটা প্রত্যাশা ছিল যেন ওর। সে প্রত্যাশা ছিল শুধু ওর একার নয়, সুগতর, মায়ের, সবার। সুগত বলেছিল, ছেলে হোক আর মেয়েই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। মায়ের অবশ্য ইচ্ছে ছিল ছেলেই হোক! আর মালিনীর নিজের? হ্যাঁ, সেও তো ছেলেই চেয়েছিল। রূপের ওপরে মোহ ছিল মালিনীর! ও মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিল, ছেলে যদি হয়, তার নাম রাখবে রূপ। আর মেয়ে হলে যে কি নাম রাখবে, তা আর ও ভাবেনি।

চোখ খুললো মালিনী। একজন নার্স ওর নাকের ওপর কি যেন একটা যন্ত্র ধরলো। মাঝখানটা বাটির মতন গোল। ওর নাক-মুখ বন্ধ করে ওই যন্ত্র ধরে সে দাঁড়িয়ে থাকলো। মিষ্টি একটা উগ্র সেণ্ট মেশানো গন্ধে মালিনীর দম আটকে আসতে লাগলো। যন্ত্রটাকে ও দু' হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে গেল। পারলো না। ও ভাবলো, আমায় কি এরা ক্লোরোফর্ম করছে! নার্স

বললো, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিন। ওর কি আবছা মনে পড়তে লাগলো, টুপুস হবার সময়কার কথা! তখন তাকে ক্লোরোফর্ম করেননি ডক্টর চক্রবর্তী। মালিনীর স্পষ্ট জ্ঞান ছিল, উহ্, সে কি অসহ্য ব্যথা! কিন্তু ওই দুঃসহ ব্যথার মধ্যে দিয়ে টুপুস বেরিয়ে এলো। ওর নরম্যাল ডেলিভারী হয়েছিল।

মালিনী এখন টের পাচ্ছে, আস্তে আস্তে ওর শরীরটা কেমন অবশ হয়ে আসছে। ও একবার ছটফটিয়ে উঠলো। প্রাণপণ শক্তিতে যন্ত্রটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেল। পারলো না। শক্তি ফুরিয়ে আসছে। ডাক্তার তখন অজস্র প্রশ্ন করে চলেছেন, আপনার স্বামী কি করেন?

মালিনী চেঁচিয়ে বলতে চাইল, জিওলজিস্ট।—কিন্তু বাইরে থেকে ওর মুখের গোঙানি ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। ডাক্তার তখনো প্রশ্ন করে চলেছেন, আপনার ফার্স্ট ইস্যুর বয়েস কত?

মালিনী যেন বহু দূর থেকে জলে-ডোবা মানুষের মতন শুনতে পেল ডাক্তারের কথা। ও বলতে চাইল ছয়।—কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলো না। ওর দম ফুরিয়ে যেতে লাগলো। হাত-পা অবশ। শিথিল হয়ে পড়ে গেল বুকের ওপর জড়ো করে রাখা হাতটা। ডক্টর সিং বললেন, আপনার ঠিকানা? স্বামীর নাম? বলুন? বলুন?

জলের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে ও শুনলো এ সব প্রশ্ন। কিন্তু ওর তখন আর জবাব দেবার ক্ষমতা নেই। মালিনীর চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ও একটু একটু টের পাচ্ছে, ওর পা দুটো নিয়ে ডাক্তার, নার্সরা যেন কি করছে। বোধ হয় কোন উঁচু স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে বেঁধে দিল। কিন্তু মালিনীর পা দুটো এই মুহূর্তে এতই অসাড় যে, ওটা যে ওর নিজের পা এই বোধটাই প্রায় লোপ পেতে বসেছে। ও যেন কোথায় মিলিয়ে

যাচ্ছে। ডুবন্ত মানুষের মতন মালিনীর খুব অস্পষ্টভাবে মনে হচ্ছে, এর নামই কি মৃত্যু? চেতনা প্রায় নেই। অথচ চেতনা আছে। নইলে পেটের মধ্যে ব্যথা করছে কেন? কি যেন একটা ধারালো যন্ত্র ঢোকানো হচ্ছে। খুব ব্যথা। ওর মুখ দিয়ে আবার গোঙানি বেরুতে লাগলো। মালিনীর চোখে এখন দুর্ভেদ্য অন্ধকার। টুপুস টুপুস, তোকে আর দেখতে পেলুম নারে।...ওগো, তুমি কোথায়?...আমি মালিনী। হ্যাঁ, এখনও বুঝতে পারছি। কিন্তু এর পর আর বুঝব না। আমি মরে যাচ্ছি।

ডক্টর সিং বললেন, ব্যস সরিয়ে নাও। ক্লোরোফর্মের আর দরকার নেই।

মালিনী চেতন এবং অচেতন জগতে ভাসতে ভাসতে ভাবলো, আমি কেন পুরো অজ্ঞান হইনি, আমি কেন এখনও শুনতে পাচ্ছি সব!

ওর ছেলের মুখ, স্বামীর মুখ, ঠাকুর দেবতা মনের মধ্যে অসংখ্য মুখ ভেসে উঠলো। মালিনী সবার কাছে যেন অস্ফুটে বিদায় চাইল। একটি অপরিচিত শিশুর কণ্ঠ ভেসে উঠলো যেন—মা, মা, মা। হয়তো সে মঙ্গোলিয়ান বেবী নয়। কিংবা হতেও পারে। মালিনী শুনলো টুপুসের কান্না। সব শিশুর কান্নাই যে এক। মালিনীর ঠোঁট নড়ে উঠলো। কিন্তু বাধা দেবার মতন কোন শক্তিই যে তার নেই। যে শিশুকে ভ্রূণেই হত্যা করা হল তার একটা অস্পষ্ট অবয়ব ওকে যন্ত্রণা দিতে লাগলো। ওকে কুরে কুরে খেলো যেন।

টুকাই

সারাদিন টুকাই বড় একা। সকালে ঘুম থেকে ওঠার আগেই মা বেরিয়ে যায় কাজে। ঘুম ভেঙে টুকাই যার মুখ দেখে, সে হলো বুড়ী আয়া। অনেকগুলো দাঁত নেই তার, ওপরের আর নীচের পাটি মিলে। টুকাই কিছুর জন্যে বায়না করলে, সে যখন হাঁ-মুখ নেড়ে তেড়ে আসে, তখন টুকাইয়ের কেন যেন মনে পড়ে যায়, রাবণ রাজার বোনের কথা। সুর্পণখা, তাড়কা এদের কথা তো সে এই আয়ার মুখেই শুনেছে। শুনতে শুনতে ওর মনে হয়, ওরা যেন তার অনেকদিনের চেনা। টুকাইয়ের আশে-পাশেই ওরা ঘোরে। টুকাই তাই সারাক্ষণ এদের খুঁজে বেড়ায় তার চেনা-জানা জগতের মধ্যে। মা যেদিন ইস্ত্রীর প্লাগ্ দিয়ে মেরে তার পিঠ ফালা-ফালা করে দিল, সেদিনও টুকাই হিড়িম্বার কথা ভেবেছিল। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলের মধ্যে দিয়ে ও দেখেছিল মা বদলে গেল। ওর মায়ের ওই সুন্দর মুখটা আস্তে আস্তে বীভৎস হতে থাকলো। টুকাই ভয় পেল। ও সরে গেল দরজার কাছে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে মা। ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে। আয়া বারান্দায় বসে, সেখানেও হাজার পাওয়ারের আলো রাতকে দিন করে রেখেছে। তবুও টুকাই দেখেছিল তার মা অবিকল হিড়িম্বা হয়ে গেল। টুকাই মোটেই ভয় পায়নি। কেননা এর আগে অনেকদিনই তো সে হিড়িম্বাকে দেখেছে বুড়ী আয়ার মধ্যে। তাকে দেখার পর এর আগেও ওর যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেদিনও তাই হলো। টুকাইয়ের খুব রাগ হলো। ওর মনে হলো, সেও যদি হিড়িম্বা হয়ে যেতে পারতো,

তবে বেশ একচোট জমতো। দুজনে মিলে দারুন বক্সিং, মারপিট। কিন্তু তা তো হবে না। টুকাই যে হিড়িম্বা হতে পারলো না। মেরে-টেরে মা তো বেরিয়ে গেল। টুকাই চোখের জল মুছে এক ছুটে চলে গেল ছাদের ঘরে। বিকট এক রাক্ষসের মুখোশ পরে আয়নার কাছে গিয়ে নানা কসরৎ করতে লাগলো। হাততালি দেবার লোক নেই। ও নিজেই দর্শক। মুখোশের ফুটো করা চোখের মধ্যে দিয়ে নিজের বীভৎস মুখের দিকে তাকিয়ে টুকাই অদৃশ্য মানুষকে ভয় দেখালো। প্রতিহিংসার আনন্দে মশগুল টুকাইয়ের খেয়াল হলো না, ঘরে কোন দর্শক নেই।

বাবার কথা মনে পড়ে টুকাইয়ের। বাবা লোকটা খুব সুবিধের ছিল না। মাকে বড় জ্বালাতন করতো। বাবা-মার বন্ধু-বন্ধু ভাব কখনো-সখনো চোখে পড়তো টুকাইয়ের। আবার ঝগড়া করতে করতে ধুন্ধুমার লেগেও যেতো। মা-বাবার যখন ভাব ভালবাসা চলতো, তখন টুকাইয়ের হিংসে হতো। কেন যেন ও সহ্য করতে পারতো না। ওর মনে হতো, মা শুধু তাকেই ভালবাসবে, বাবা শুধু তাকেই চাইবে। অনেক রাত্তিরে হঠাৎ যদি কোনদিন কাকজ্যোৎস্নায় ঘুম ভেঙে যেতো ওর, টুকাই দেখতে পেতো মা-বাবার সেই বন্ধুত্ব। ওরা গলাগলি করে ঘুমুচ্ছে, কিংবা গল্প করছে খুব আস্তে আস্তে। রাগে, দুঃখে, অভিমানে টুকাইয়ের কান্না পেতো। ও অবাক হয়ে ভাবতো, ওদের আবার ভাব হলো কখন? ঝগড়াই তো দেখেছিল সে রাত্তিরে ঘুমনোর আগে। কখনই বা ভাব হয়, কখনই বা আড়ি হয়, টুকাই কিচ্ছু বুঝতে পারতো না। ও শুধু গালে হাত রেখে ভাবতো আর ভাবতো। বালিশ নিয়ে চলে যেতো ও অন্য ঘরে। তখন মা-বাবার সে কি হাসি। ছুটে যেতো ওর কাছে মা আর বাবা। ওকে আদর করে, কাতুকুতু দিয়ে হাসিয়ে তবে যেন ওদের শান্তি।

ওর জন্যে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা হয়েছিল। যখন বাবা-মার

ভাব থাকতো, আড়ি হতো না, সেই তখন ওরা টুকাইকে পাঠাতে চাইতো আলাদা ঘরে। ছোট্ট খাটে ছোট্ট বিছানা-বালিশ। টুকাইয়ের পছন্দের জিনিসগুলো চলে গেল ওঘরে। ওর ছোট্ট সাইকেল, ওর ছোট্ট ক্যারামবোর্ড ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট, কত রকমের গাড়ি, প্লেন, নীল সবুজ লাল। দরজার গায়ে বাবা লিখে দিল, টুকাইবাবুর ঘর। সেখানে দেওয়ালে টাঙানো হলো হামটি-ডামটির ছবি, গন্ধমাদন পর্বত মাথায় করে নিয়ে যাওয়া হনুমানের ছবি, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী ঘুমন্ত রাজপুত্তুরকে পাহারা দিচ্ছে অশত্থগাছের ডালে বসে। মা ভাল ছবি আঁকে। এ ছবিগুলো তো সব মায়েরই আঁকা। টুকাইয়ের দারুণ প্রিয় ছবিগুলো এঁকে তাই তো মা ওর মন ভোলাতে চেয়েছিল, কিন্তু তবু মন ভরেনি টুকাইয়ের। ঘুমুনোর সময় মাকে যে তার চাই-ই চাই। যেমন ব্যাটবল কেনার সময় সে চাইতো বাবাকে।

মা-বাবার অশান্তি বেড়েই চললো তারপর। আগে তো ঝগড়া হতো, ভাবও হতো। কিন্তু পরে আর তা হলো না। দেখা হলেই দু'জনের কেবল কথা কাটাকাটি। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতো না। তখন টুকাইয়ের কি যে খারাপ লাগতো। ওর মনে হতো, এর চেয়ে সেই ভাবের দৃশ্যই যে ছিল অনেক সুন্দর। ইস! আবার যদি বাবা-মা বন্ধু হয়ে যেতো! টুকাই না হয় থাকতো পাশের ঘরে। যে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে লোভনীয় ছবি। যে ঘরটাকে ওর ভাল লাগানোর জন্যে মা কত যত্নই না করেছিল। তবু টুকাইয়ের ভাল লাগেনি সে ঘর!

একদিন টুকাইয়ের বাবা চলে গেল বিলেতে। বাবার এই যাওয়া নিয়েও মার সঙ্গে প্রায়ই খণ্ডযুদ্ধ হতো। মা চাইতো না, বাবা যাক। তবু বাবা যাবেই। বাবার যাওয়ার ইচ্ছেটার মধ্যেও একটা কোন গণ্ডগোল আছে, টুকাই ঠিক বুঝতে পারতো। মাকে নিয়ে যেতে চায়নি বাবা, মাও যেতে চায়নি বাবার সঙ্গে।

টুকাইয়ের কিন্তু খুব ইচ্ছে হতো বাবার সঙ্গে যেতে। মার চোখের দিকে তাকিয়ে সাহস পায়নি বলতে। বাবাও তো একবার বলেনি তাকে যেতে। নীল সাগরের ওপারে বিলেত। বিলেত দেশটা কেমন? ওখানে মেম, সাহেবরা থাকে। নীল নীল সমুদ্র,…কত সোনালী মাছ…। আয়াটা গল্প করে। টুকাইয়ের মন কেমন করে। ওই গল্প শুনতে শুনতে ও ছাই একদিন পাগল হয়ে যাবে।

বাবা যাওয়ার আগে শুধু আড়ালে আড়ালে কাঁদতো মা। টুকাই কতদিন দেখেছে, মার সেই ফুলো-ফুলো চোখ দুটো। টুকাই বাবাকে বলতে চেয়েছে, মাকে তুমি কেন নিয়ে যাচ্ছো না বাবা? মা যে কাঁদছে। কিন্তু ও বলেনি। মা সে কথা বলা পছন্দ করবে না, ও বুঝতে পেরেছিল। মা বলে, টুকাই তুমি খুব পাকা। ওই আয়াই তোমায় পাকিয়ে দিচ্ছে।—টুকাই ভাবে, মা তো সবই জানে। তবু কেন আয়ার কাছেই তাকে রেখে যায়। রন্টিদের মা বাড়িতেই থাকে, রান্না করে, উল বোনে। ইস! তার মা যদি বাড়িতে থাকতো রন্টির মার মতন? তা না, ব্যাগ দুলিয়ে দুলিয়ে কেবল অফিসে যাওয়া চাই। খুব করে বকতে ইচ্ছে করে টুকাইয়ের মাকে।

বাবা যেদিন চলে গেল, সেদিন দমদম এয়ারপোরটে রওনা হবার সময় মাকে বাবা দেখতে পায়নি বাড়িতে। মা যেন কোথায় চলে গিয়েছিল। বোধ হয় বুলিমাসীদের বাড়িতে। বুলিমাসী মার খুব বন্ধু কিনা। বাবা যাবার সময় টুকাইকে একটু আদর করে গেল। অনেকগুলো ক্যাডবেরী দিয়ে বললো, তুমি বেশি দুষ্টুমি করবে না, কেমন? লেখাপড়া করবে। একটা আব্বা দাও তো আমার গালে।—বাবার গলা জড়িয়ে দু গালে খুব জোরে দুটো আব্বা দিয়ে দিল টুকাই। বাবাকে ওর ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। কান্নায় ওর গলা বুজে আসছিল। তবুও কাঁদেনি।

যতদূর গাড়িটা দেখা যায়, টুকাই টা-টা করলো বাবাকে। বাবাও গাড়ির জানলায় মুখ বাড়িয়ে থাকলো। বাবার চোখ কি ছল্ ছল্ করছিল? টুকাই বুঝতে পারলো না। বাবাকে বললেই বাবা নিয়ে যেতো, টুকাই জানে। কিন্তু মাকে ফেলে যে ওর যেতে ইচ্ছেই করলো না। টুকাই জানতো, মাও তাকে ছাড়তো না। মার খুব ইচ্ছে, টুকাই তার কাছেই থাকে। বাবার যে কি ইচ্ছে ছিল, তা আর টুকাই বুঝতে পারলো না। বাবা বড় খারাপ। তাকে নিয়ে যাবার কথা একবারও বলেনি কেন? টুকাই খুব রাগ করেছে তাই বাবার ওপরে। আবার যদি বাবা আসে, ও কথা বলবে না, মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে।

এখন গরমের ছুটি। স্কুল বন্ধ। বাড়িতে এই চার দেওয়ালের মধ্যে ওর আরোও একা একা লাগে। কবে যে শনিবার, আর কবেই রবি হয়, ও কিচ্ছু বুঝতে পারে না। মা রোজই বেরোয় কিনা। আগে তো শনিবার মা'র হাফ ছুটি ছিল, রোববার ফুল। ওই হুটো দিন কেন আর ছুটিব দিন হয় না ওর মায়ের? চিড়িয়াখানা, যাহুঘরে সেই কতদিন আগে গিয়েছিল টুকাই মা আর বাবার সঙ্গে। তখন তো ছোট্ট ছিল। এখন তো বড় হয়েছে। মা-টা যে কেন বোঝে না! আজকাল টুকাই ময়ূর চিনতে শিখেছে। গণ্ডারের নাম রায়নোসেরাস, ময়ূরের নাম পিকক্, কুমীরের নাম ক্রোকোডায়েল, সবার ইংরিজী নামই তো সে আজকাল জানে। আগে জানতো না, যখন ছোট্ট ছিল টুকাই। চিড়িয়াখানায় গিয়ে মা, বাবা কতবার বললো, এই হ্যাখ ময়ূর, ময়ূর হ্যাখ। ও তখন কিছুই দেখেনি। ও শুধু আপন মনে আইসক্রীমের কাঠি কুড়িয়েছিল। টুকাই ভাবলো, মা যদি তাকে আবার নিয়ে যেতো চিড়িয়াখানা, ও আর মোটেই আইসক্রীমের কাঠি কুড়তো না। ও এবার ঠিক ময়ুর দেখতো।

আয়া খাবার নিয়ে ডাকলো, টুকাইবাবু খাইবে না? না,

টুকাইবাবু আজ খাইবে না।—মুখ ভেংচে বললো টুকাই। রোজই শুধু খাওয়া, খাওয়া। এতো খেতে ভাল লাগে কি টুকাইয়ের? আয়াটা তবু নাছোড়বান্দা, খেতে হইবে টুকাইবাবু। মছরি দিয়া, মাখুন দিয়া, সিদ্ধ দিয়া ভাত।

সেই তোবড়ানো গাল, কালো কদাকার চেহারা নিয়ে এগিয়ে এলো আয়া। পান-খাওয়া লাল ঠোঁট নেড়ে টুক করে একটা চুমুও খেয়ে ফেললো। রেগে গেল টুকাই। ও একদম পছন্দ করে না, ওর এই সব আদর-টাদর। বুড়ী আয়া তবু শোনে না, সে জোর করেই টুকাইকে আদর করে, কাছে টানে। টুকাই অন্যদিনের মতই হাত দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেললো গালটা। চোখ পাকিয়ে বললো, বলেছি না, আমায় আব্বা দেবে না?

খিল খিল করে হেসে উঠলো আয়া। টুকাই হঠাৎ কেঁদে ফেললো ভ্যাঁ করে। মার উপরে অভিমানে ভবে গেল মন। মা কেন তাকে রেখে যায় ওই আয়ার কাছে। কান্নায় ফোলা টুকাইয়ের লাল চোখের দিকে তাকিয়ে আয়া বললো, সুকালে মা বকিছে? মেরিছে? মাকে হামি বকি দিব। মেরি দিব।

এই খবরদার! আমার মাকে বকবে না, মারবে না।

টুকাইবাবু, তুমি তোমার বাবার কাছে চলিয়ে যাও। সেই নীল সমুদ্দুর পাঁর হোঁয়ে⋯।

খুশিতে নেচে উঠলো টুকাইয়েব চোখ দুটো। টুকাইয়ের মনে হলো, এতো ভাল কথা আয়াটা তাকে এতদিন শোনায়নি কেন? টুকাইয়ের মনে হলো আয়াটা যেন তার বাবার দূত। টুকাই বললো, কেমন করে যাবো?

উঁড়ো জঁাহাজে। আঁকাশে।—মাথার ওপরে আঙুল ঘুরিয়ে বললো আয়া।

আমার মাকে নিয়ে যাবো?

কিন লিবে?

প্রবল আত্মমর্যাদাবোধে মাথা নেড়ে টুকাই বললো, তবে যাবো না।

আয়া ফের ওকে কাছে টেনে আদর করে বললো, তুমার মাকে বাবা যে বকতো টুকাইবাবু।

বকুক না। তোমার কি ?—

আয়ার মুখে বাবার নিন্দেও যে অসহ্য লাগে টুকাইয়ের। আয়া হাসলো। বললো, হামার কুছু না।

একা বসে বসে টুকাই ভাবছে, তাই তো মাকে বাবা বকতো কেন ? দারুণ চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে রইল টুকাইয়ের ছোট্ট মাথা। বাবা একটা আন্টির বাড়িতে যেতো। টুকাইকেও নিয়ে গেছে কতদিন। গাল টিপে সোনা, সোনা বলতো আন্টি। টফি দিত, চিকলেট। আন্টি বলতো, মাকে বলো না, কেমন ? তবু মাকে বলে ফেলতো টুকাই। মা যে তার একটা বন্ধু ছিল তখন। টুকাই ওখানে যাক, মা সেটা একদম চাইতো না। বাবার যাওয়াও পছন্দ করতো না মা। যেদিনই বাবা আন্টির বাড়ি যেতো, সেদিনই বাডিতে শুধু ঝগডা। অনেক রাত্তির ছাদে গিয়ে বাবা বোতল থেকে ওষুধ খেতো। বোতলের ওষুধ খেয়ে বাবাটা পাগলার মতন শুধু কথা বলে যেতো।

মা একদিন বুলিমাসীকে বলছিল, ওই আন্টিটাও নাকি বাবার সঙ্গে বিলেত গেছে। আন্টিটা দুষ্টু। বাবাকে নিয়ে কেন চলে গেল বিলেতে ? মা যদি আগে জানতে পারতো, ওই আন্টিটাকে একদম খতম করে দিতো।

একদিন সে বিলেত যাবে, টুকাই ভাবলো। দমদম এয়ারপোরটে গিয়ে সে দেখবে, কোন্ প্লেনটা সবচেয়ে ভাল। রেড-কালার ওর বড় প্রিয়। একটা রেড কালারের প্লেনে চেপে ও সোজা চলে যাবে বিলেতে। নীল সমুদ্রের ওপর দিয়ে মাকে নিয়ে যেতে-যেতে টুকাইয়ের…। কত মেঘ, নীল আকাশ, পরীর দেশ

পেরিয়ে টুকাইবাবু—। তার এই চাবি দিয়ে ঘোরানো খেলার প্লেন নয়। যে প্লেন সত্যিকারের ওড়ে আকাশে। সেই সুন্দর লাল রঙের প্লেনে চেপে টুকাই মেঘের দেশ, পরীর দেশ পেরিয়ে পেরিয়ে ভোঁ…। ও তো নিজেই প্লেন চালাবে। বুড়ি আয়াটাও সঙ্গে থাকবে না হয়। নইলে তাদের খেতে দেবে কে। বাবা তো অবাক হবে, তোমরা এখানে এলে কি করে,—আন্টিটা কি সেদিনও টফি দেবে? দিক। তবু টুকাই ভালবাসবে না তাকে। বিলেতের পুলিশকে ফোন করে ও বলবে, হ্যালো পুলিশ! একে অ্যারেস্ট কর, এই আন্টিকে। ও তো ছেলেধরা, আমার বাবাকে চুরি করে পালিয়ে এসেছে কেন? তারপর? আন্টি তো বন্দী হয়ে থাকবে জেলে। আর বিলেতে বাবার বাড়িতে মজা করে থাকবে ওরা তিনজন। বাবা, মা আর টুকাই।

আলমারীর গায়ে চাবিটা ঝুলছে কেন? নিশ্চয় মা ভুলে লাগিয়ে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে শোবার ঘরে ঢুকে পড়লো টুকাই। মার যে কি মনের ভুল। মুখে হাত চাপা দিয়ে টুকাই খুব খুশীর হাসি হাসলো। বড় লোভ ওর, মার ওই আলমারীটার ওপর। যার ভেতরে অনেক জিনিস। যে জিনিসগুলো কখনো মা ছুঁতে দেয় না তাকে। চাবি ঘুরিয়ে আলমারীর পাল্লা খুললো টুকাই। আবিষ্কারের আনন্দে নেচে উঠলো ওর চোখ দুটো। সে এখন বড় হয়েছে। বড়দের মতন, মার মতন, বাবার মতন আলমারীর পাল্লা খুলতে জানে। জিনিসপত্র তছনচ করতে করতে টুকাই দেখলো, কত যে ঝলমলে শাড়ি তার মার। সেই শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে মার্বেলের মতন সাদা সাদা ন্যাপথলিন। ন্যাপথলিন দিয়ে ও মার্বেল খেললো, ছুঁড়ে ছুঁড়ে জানলা দিয়ে পাখি মারার আপ্রাণ চেষ্টা করলো। তখন টুকাইয়ের মনে পড়লো, এসেন্সের শিশির কথা। শাড়ির তলায় এসেন্সের শিশি। তার মার গায়ের গন্ধ। কি সুন্দর যে গন্ধ। গায়ে মাথায় পাগলের মতন সেন্ট

ঢাললো টুকাই। ঘরের বাতাস ভুর্ ভুর্ করতে লাগলো ইনটিমেট সেন্টের গন্ধে। টুকাইয়ের কেমন নেশা ধরে গেল। ওর যেন লোভের শেষ নেই, আলমারীর ওই জিনিসপত্রের ওপর। আর কি আছে? কি আছে মার ওই অসংখ্য শাড়ির তলায়? খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎই চোখে পড়ে গেল বড় একটা খাম। খামটা খুলতেই ঝপ্ করে ছড়িয়ে পড়লো কিছু ছবি। বাবার সঙ্গে মার, মার সঙ্গে বাবার, টুকাইয়ের সঙ্গে মার, বাবার সঙ্গে টুকাইয়ের হাসি হাসি ভালবাসার ছবি। বাবার কোলে ক্ষুদে টুকাই, ছোট্ট টুকাই, বড় টুকাই। মাঝারি, ছোট, বড় কত মাপের বাবা হাসছে। আশ্চর্য, টুকাই বোকার মতন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। তারপর বাবার ছবির সঙ্গে শুরু হলো তার বকবকানি, অনেক কথা বলল টুকাই। বাবা বাবা বলে ডাকলো ও অনেকবার। এ বাড়িতে বাবার কোন ছবি নেই। সব ছবিই মা লুকিয়ে রেখেছিল তবে। টুকাই যেন বহুদিন পর ফিরে পেল তার সেই হারানো বাবাকে। বাবা, বাবা, তুমি যে রেড বলটা কিনে দিয়েছিলে না? রন্টি ফেলে দিয়েছে নালায়। রণ্টিটা একদম বল্ করতে জানে না বাবা। দারাসিং-এর মত তারপর কুস্তী হয়ে গেল দু'জনের। আমি জিততে পারিনি। আমি খুব রোগা কিনা? একদম খাই না। রন্টি খুব খায়। খেতে ও মোটেই ঝামেলা করে না। যারা খায়, তারাই বক্সিং-এ জেতে। আয়া বলেছে। আমি খাই না, পড়ি না, আমি একটা ভূত। মা বলে। মা আমায় মারে। জানো বাবা? ইস্তীরির প্লাক দিয়ে মা ফ্রাই-ডেতে আমায় মেরেছিল—এই পর্যন্ত বাবার সঙ্গে কথা বলার পর কথা থেমে গেল টুকাইয়ের। মায়ের চটির আওয়াজটা ওর চেনা। টুকাই বার বার ঢোঁক গিলতে লাগল।

সুস্মিতার মেজাজ তো সপ্তমে চড়লো, যখন দেখলো আলমারীর জিনিসপত্র সারা ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে টুকাই তোতা পাখির

মতন বক বক করছে তার বাবার ছবির সঙ্গে। পিতাপুত্রের এই মিলনে খুশী হতে পারলো না সুস্মিতা। সেই অপ্রীতিকর লোকটা যার সঙ্গে ভাগ্য জড়িয়ে তাকে এখন পস্তাতে হচ্ছে, সে টুকাইয়ের বাবা। টুকাইয়ের মন থেকে ও কি কিছুতেই পারবে না নবেন্দুকে মুছে ফেলতে? এ বাড়িতে নবেন্দুর আর কোন চিহ্নই থাকবে না। বাবাকে ভুলে যাবে টুকাই। তার ছোট্ট মনে যাতে কোন রেখাপাত না করে, সেজন্যেই সুস্মিতা লুকিয়ে রেখেছিল ছবিগুলো। তাদের দাম্পত্য জীবনের ছবি, হোক নবেন্দু বিশ্বাসঘাতক, তবু তাকে কেন্দ্র করে দু'জনের সুখ-দুঃখ—সেই ছবিগুলো নিষ্ঠুরের মতন অ্যালবাম থেকে টেনে নিয়েছিল সুস্মিতা। ও জানতো, টুকাইয়ের বুকের মধ্যে তার বাবার ছবি আঁকা। সেই ছবিটাকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল সুস্মিতা। একদিনে নয়, দিনে দিনে। কোন ছবিই আর নবেন্দুর থাকবে না টুকাইয়ের চোখের সামনে। ক্রমাগত অদর্শনে সে একদিন ভুলে যাবে তার বাবাকে।

বড় হলে নবেন্দুর আসল স্বরূপ চিনবে টুকাই। ওই দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোকটার ওপর ওর আর কোন মোহই থাকবে না। ও ভেবেছিল, একটা কাঁচঘরের মধ্যে বন্দী তার ছেলে। সে ঘরে পৌঁছুবে না খবর—নবেন্দু বলে কেউ···ওই লোকটার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিল সুস্মিতা···একটা অপদার্থ মানুষ টুকাইয়ের বাবা ···যে তার মাকে ফেলে পালিয়েছে একটা বাজে মেয়েকে নিয়ে।

কাঁচপোকার মতন চক্ চক্ করে উঠলো সুস্মিতার চোখ। ওর সেই কাঁচঘরে ছিদ্র কেন? ও সমস্ত শক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলো, টুকাই!

টুকাইয়ের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল জল, ভয়ে না অভিমানে সুস্মিতা বুঝতে পারলো না। ওর ছোট্ট হাতের মুঠো থেকে ছিট্‌কে পড়লো ওর বাবার ছবিটা।

ছোট কাকঝোরার রাস্তাটা ধরে নামছে মানু। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে আগে আগে চলছে সনৎদা, পেছনে মানু। শ্লেটের মতন অন্ধকার তখন চারদিকে। তারপর আবার কুয়াশা, কিছু দেখা যাচ্ছে না কোথাও। শুধু নীচে কার্টরোডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা জীপের হেডলাইটটা জ্বলছে চিতাবাঘের চোখের মতন। রাস্তার দুপাশে কয়েকটা বার্চ গাছ। তার ফাঁকে চোখে পড়ে আকাশের গায়ের কয়েকটা তারা। সনৎদা বলল, শালা, আমাদের বরাত আজ কেমন কে জানে?

মানু বলল, কেন?

সনৎদা বলল, সান্‌রাইজ-ফাইজ দেখা কি আর ভাগ্যে জুটবে? আমাদের যা অবস্থা, এখন প্রচুর ফগ্‌ রয়েছে।

মানু কিছু বলল না। সনৎদা টর্চের আলোটা পেছনে ফেলে একটু ঘুরে তাকাল। বলল, দেখেশুনে পা ফেলিস মানু। পা ফস্‌কে আবার পড়ে-টড়ে যাস না যেন, যা একখানা প্যাণ্ট পরেছিস।

মানু একটু হাসল। ওর কথা বলার মতন মনের অবস্থা তখন নেই। ঠাণ্ডায় চোখ জ্বলছে। ঘুমটুম ভাবটা যেন এখনও যায়নি। ছোটো একটা হাই তুলল মানু। সনৎদা বলল, কি রে চুপ করে রয়েছিস যে? মিঠু চৈতালীরা তোকে এই পোশাকে দেখলে খুব হাসত। বলত, টিপিক্যাল সিজনার, তাই না?

উহুঁ, বলত, ভালুক।—মানু আরেকবার হাসবার চেষ্টা করল। অবাক হয়ে তাকাল সনৎদা। বলল, ভালুক? ভালুক কেন রে?

কি জানি কেন? ম্যালে সিজনারদের একগাদা করে গরম

জামাপরা দেখলেই ওরা হাসে। বলে, ভালুক।

সনৎদা হো হো করে হাসল। বলল, রিয়েলি?

ম্যাজেস্টিক হোটেলের নীচে এসে দাঁড়াল ওরা।

তুই এগো মান্নু, না-হয় গাড়িতে গিয়ে বস। আমি দেখি হোটেল বাসিন্দাদের ঘুম ভেঙেছে কিনা—কথাগুলো বলতে বলতে সনৎদা হাতদুটোকে চোঙের মতন করে তার মধ্যে মুখ রেখে চেঁচিয়ে ডাকল, কাজল, পিণ্টু...

দপ্ করে জ্বলে উঠল ম্যাজেস্টিকের দোতলার আলোটা। একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল হোটেলের ব্যালকনিতে। সেও প্রায় সমান জোরে চেঁচিয়ে বলল, আ—স—ছি।

অন্ধকার কুয়াশা এবং আলোয় মান্নু চিনল কাজলকে। কাজল কম্ফর্টারকে পাগড়ির মতন করে জড়াতে জড়াতে বলল, মান্নু এসেছে তো সনৎদা?

সনৎদা বলল, এসেছে।

কথাটা শুনে মান্নু একনজর তাকিয়ে নিল ওপরে। ব্যালকনির একশো পাওয়ারের আলোয় ও দেখল কাজলের চোখের পাগলামী।

ঠিক এজন্যে, এজন্যেই ওর ভাল লাগে না কাজলকে। ও একটা বাচাল। অনর্থক ফাল্তু কথা বলে। ও তো জানতই মান্নু আসবে। তবু কেন প্রশ্ন করল আবার? ওদিকে জীপের ড্রাইভার অনবরত হর্ন বাজাচ্ছিল। সনৎদা আরেকবার চেঁচিয়ে বলল, মান্নু, তুই গাড়িতে যা, আমি আসছি।

জোরে ছুটতে চেষ্টা করল মান্নু, কিন্তু পারল না। পরনে ওর চাপা প্যাণ্ট তারপর আবার কাল ঘোড়ায় চড়ে কোমরটোমর সব ব্যথা হয়ে রয়েছে। ম্যাল থেকে জলাপাহাড়, জলাপাহাড় থেকে ম্যাল। সোজা দূর তো নয়। পথ বেশ খাড়া। ঘোড়াটাও ছিল বেয়াদপ। কাজল ইচ্ছে করেই বেছে বেছে খারাপ ঘোড়াটা দিয়েছিল তাকে। শুধু তাই নয়, ওটাকে উস্কে দেবার জন্যে পেছন

থেকে সমানে ছু ছু করছিল কাজল। ও যত ছু ছু করছিল, ঘোড়াটা ততই জোর ছুটছিল। ভাগ্যিস গাইড ছিল, নইলে ওটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারত না মান্নু।

বদমাশ।—মান্নু বিড়বিড় করল।

দার্জিলিঙে আসবার পর থেকে এ সাতদিন ধরে চরকির মতন ঘুরছে ও কাজলদের সঙ্গে। ভাল লাগছে না, তবু নেশার মতন ও ঘুরছে। কলকাতার জীবনটাকে পুরোপুরি পালটে দিতে চায় মান্নু। যার তার সঙ্গে মিশবে, যেখানে খুশি যাবে, যা খুশি তাই করবে। কোন রুচিফুচির ধার ধারবে না। তাই আজ ইচ্ছে করেই ও চোঙা প্যাণ্ট পরেছে, যা অসহ্য লাগে ছেলেদের পরনেও। কোট পরেছে ছেলেদের মতন, আর কলকাতার মার্কামারা মস্তান কাজলদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে সেখানে।

সেদিন ম্যালে হঠাৎ দেখা, থমকে দাঁড়িয়ে গেল মান্নু ওদের দেখে। কেন যেন ভাল লাগল কলকাতার ছেলেটাকে দার্জিলিঙে পেয়ে। একই পাড়া যোধপুর পার্কের বাসিন্দা ওরা। রকে বসে আড্ডা দেয় ছোকরাগুলো। মান্নুরা ওদের পাত্তাও দেয় না কলকাতায়, কিন্তু এখানে যখন দেখা হল তখন কেন যেন দেশের টান এসে গিয়েছিল। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল মান্নু, পিস্তুতো দাদা সনৎদার সঙ্গে, পিসি, পিস্তুতো বোন মিঠু, চৈতালীর সঙ্গে।

জীপের কাছাকাছি পৌঁছেও নিজের মুখ দেখল ভ্যানিটি ব্যাগের আয়নায়। ঠোঁটে আলতো করে বুলিয়ে নিল লিপস্টিক। তারপর একটু যেন মোনালিসার হাসি হাসল আয়নায়। ছুঁচলো একটা ব্রা পরায় ওর বুকটা উদ্ধতভাবে ফুলে উঠেছে পুরুষের কোটের ওপর দিয়ে। হায়রে, ও দেখল না দার্জিলিঙে এসে কি দারুণ পালটে গেছে মান্নু। এই একদল ছেলের মধ্যে ওকে দেখলে তো হার্টফেল করবে অলক।

পক্ পক্ করে হর্ন বাজাল আবার জীপের ড্রাইভার ওয়াংগাল।

মান্নুকে দেখে একটু হাসল। বলল, এত্‌না দেরি? তারপর বড়দান বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। মান্নুর বেশ লাগল নেপালী মানুষের এই অদ্ভুত বাংলা। চ্যাপটা নাক, ছোট ছোট চোখ, ফর্সা গালে দু-চারটে দাড়ি। ওর সমস্ত মুখে যেন একটা হাসির আভাস। মান্নু চেয়ে রইল ওয়াংগালের দিকে।

কেমন লাগছে আমাদের দাজুর বাংলা? পেছনে চেনা গলার আওয়াজ। ও ঘুরে তাকাল। একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল, আরে টিয়াদা যে, কখন এলেন?

অনেকক্ষণ। তারপর আমাদের দাজুর বাংলা কেমন লাগল? টিয়াদা হাতের দস্তানাটা সমান করতে করতে আবারও বলল, চমৎকার। ওই আমার তিনি কি ভন্‌দাইছ নেপালী বলার মতন বাংলা আর কি।

হেসে ফেলল টিয়াদা। আর দাজুও। সেও যেন উপভোগ করল মান্নুর এ কৌতুক।

জানো, কাল সারারাত ঘুমোইনি। টিয়াদা বলল।

কেন বলুন তো? কপালে ভুরু তুলে তাকাল মান্নু। কথাটা এড়িয়ে গেল টিয়াদা। বলল, ভেবেছিলাম আসব না। শেষ পর্যন্ত এলাম।—গাঢ় শোনাল যেন টিয়াদার গলা। একটা দুর্বল মানুষ। ওর চাউনিটাও খুব দুর্বল। মান্নু এক পলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। মেয়েদের জীবনটা যেন কেমন। মান্নুর মনে হল যে, সে লোক যখন তখন প্রেমে পড়তে চায়। অথচ আর একজন চায় কি না চায়, তার ইচ্ছে আছে কি না আছে সে কথা একবার ভেবে দেখে না। আচ্ছা যন্ত্রণার ব্যাপার। ও প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পায়চারি করতে লাগল। আর দূর থেকে আড়চোখে চেয়ে দেখতে থাকল টিয়াদার চোখ। পুরুষ জাতটা বড় দুর্বল। মান্নু ভাবল, হেসে এদের সঙ্গে দুটো কথা বললেই যেন গলে যায় এরা। কিন্তু আমরা মেয়েরা? উঁহু, আমাদের মন পাওয়া অতো

সহজ নয়। আমরা স্রেফ একটু নাচাই। নাচিয়ে আনন্দ পাই। আর কিছু নয়। এ যেন এক ধরনের খেলা। ও তৃতীয় ব্যক্তির মতন মেয়ে জাতটাকে একটু দেখে নিল।

টিয়াদা বলল, ক্যামেরা এনেছি মান্নু। আজ তোমার অনেক-গুলো ছবি তুলব।

তুলুন। সিঙ্গল নিশ্চয়ই? লাস্যময়ী তরুণীর ঢঙে মান্নু দাঁড়াল। একটু প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছে হল টিয়াদাকে। কিন্তু পারল না। পরমুহূর্তেই নিজেকে ও গুটিয়ে নিল। ভাবল, কী লাভ? একালের মেয়েরা তো আর সবাই এক নয়। সবাই হালকা নয়। যারা নয়, মান্নু সেই তাদের দলে।

মাঝে মাঝে অলকটাকে ওর জব্দ করতে ইচ্ছে হয়। ভীষণ রকম একটা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে জেগে ওঠে। কিন্তু পারছে না তো মান্নু? অলকের কথা ভাবলেই কেন যেন চোখে জল এসে যায়।

মেয়েদের শরীরটাকে তো পুতুলের মতন মনে করে অলক। হৃদয়-টিদয় ও বোঝে না। মান্নুকে নিয়ে হয়ত তাই খেলা খতম ওর। এখন ও নতুন মুখ চায়। সোনালী রায় সেই নতুন মুখ ওর।—বদমাশ। বেইমান।—মান্নু বিড়বিড় করল। ওর কান দুটো অসহ্য গরম আর লাল হয়ে উঠল। (একালের ছেলেগুলোই বেইমান। ওরা নাচায়। একালের ছেলেমেয়ে সবাই নাচায়। কেউ ভালোবাসে না কাউকে। এসব কথা ভাবলে বুকের মধ্যে চাপা একটা যন্ত্রণা হয় মান্নুর। কষ্ট হয় নিঃশ্বাস নিতে। বেঁচে থাকার যেন মানে হারিয়ে যায়। অথচ বাঁচতে হবে।)

সদলবলে সনৎদা আসছে। হই-হই করতে করতে আসছে কাজল আর পিন্টু। ঘুমন্ত শহরকে যেন জানিয়ে জানিয়ে আসছে ওদের এই আসার কথাটা। কাছাকাছি হল ওরা। টিয়াদা বলল, বেশ দেখালে তোমরা! সাড়ে তিনটে থেকে আমি এখানে।

শাটআপ্। কাজল চেঁচিয়ে উঠল উল্লাসে। পিন্টু টুইস্ট শুরু

করল। আর কাজলটা শিস দিতে দিতে একেবারে মান্নুর গায়ের কাছে এসে পড়ল। একটু চোখ টিপে কাজল বলল, মেমসাহেবের পোশাকটা তো জব্বর হয়েছে। মান্নু জবাব দিল না। কাজল আরেকবার চোখ টিপে বলল, জাস্ট লাইক হেমা মালিনী। মান্নুর আপাদমস্তক যেন জ্বলে গেল। কঠিন চোখে কাজলের দিকে তাকিয়েই ও গাড়িতে গিয়ে বসল। পিণ্টু টুইস্ট নেচেই চলেছে। কাজল একটা সিগারেট বার করে সনৎদাকে বলল, খেতে পারি উইথ ইওর পারমিশান?

নিশ্চয়। সে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং তো কাল হয়েই গিয়েছে। কোমরে হাত রেখে স্মার্ট হবার চেষ্টা করল সনৎদা।

মান্নু অবাক হয়ে দেখল, কবিতা লেখা ভাবুক সনৎদাও বেমালুম চ্যাঙড়া হয়ে গিয়েছে। নিজেও একটা সিগারেট ধরিয়ে সনৎদা মান্নুকে বলল, কি রে চলবে নাকি?

সাবাস্। কাজল সনৎদার করমর্দন করেই প্রায় লাফিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসল। ড্রাইভারের সিট টপকে মান্নুর পাশে সামনের সীটে বসে পড়ল কাজল। মান্নু বোকার মতন তাকাল। নিজেকে খুব অসহায় বিপন্ন বলে মনে হল যেন।

কার্ট রোড দিয়ে ছুটছে জীপ। বাঁদিকে পাহাড়, ডানে খাদ। ওরা পেছনে ফেলে রেখে গেল কাকঝোরা। নীচে মহাকাল লজের আলোটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে দেখতে গেল মান্নু। সামনে, পেছনে আরও কয়েকটা ল্যাণ্ডরোভার আর জীপ যাচ্ছিল।—মান্নু রে, এরাও আমাদের টাইগার হিলের যাত্রী। আজ বেশ ভিড় হবে মনে হচ্ছে। সনৎদা বলল।

ওখানেও আবার লাইন-টাইন পড়ে নাকি? সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল কাজল। টিয়াদা পেছনের সীট থেকে বলে উঠল, পড়ে না? এই তো সিজন টাইম। ম্যালে দেখছ না দেশ-বিদেশ থেকে কত সিজনার এসেছে?

আসবেই তো। সনৎদা বলল, দার্জিলিং বেড়ানোর পক্ষে এটাই তো সিজন টাইম। মে-জুন মাসে লোকে আসে বটে। কিন্তু তখন অনবরত বৃষ্টি পড়ে আর তার ফলে ধ্বস নামে।

রিসেনটলি যা ঘটে গেল একজন ফিল্ম স্টারের।—কাজল খুব রহস্যময় ভঙ্গিতে বলল। মান্নু তাকিয়ে দেখল কাজলকে। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। শুধু জীপের এঞ্জিনের আওয়াজ। নিঃশব্দে সিগারেট টেনে চলছে সবাই। বাইরে কুয়াশা ভেতরে ধোঁয়া। খুব ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করছে কাজল। মান্নু বুঝতে পারছে। কাছাকাছি সরে আসছে কাজল। অথচ কিছু করার নেই। ওর একটা হাতে সিগারেট, অন্য হাত দ্রুত চলছিল মান্নুর শিরদাঁড়ায় ওপর থেকে নীচেয়। মান্নু যেন বোবা। শুধু চোখের কটাক্ষে ক্ষত-বিক্ষত করতে চাইছে কাজলকে। জেগে-থাকা মানুষের ঘুম যেমন ভাঙান যায় না, তেমনি দেখেও না দেখার ভাব করছে কাজল। পেছনের সীটে সনৎদা, যতই হোক দাদা তো। বুক কাঁপছে মান্নুর। অসহায়ের মতন পিঠটাকে ও ঠেসে রাখল সীটের গায়ে। ঠিক তেমনি মুহূর্তে দুম্ করে বলে বসল পিণ্টু—শালা, জায়গা না পেলে লোকের ঘাড়ে চড়েই দেখব। শুনেছি, দার্জিলিঙের সান্‌রাইজ নাকি সে এক জিনিস মাইরি।—কেউ সায় দিল না পিণ্টুর কথায়। খক্ খক্ করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে পিণ্টু বলল আবার, পুরো সানরাইজ নাকি সবাই দেখতে পায় না। শালা, সে দেখা নাকি মহাভাগ্যের ব্যাপার। শোন কাজল, আমরা যদি ফিপটি পারসেণ্ট দেখি তো কলকাতায় গিয়ে বলব হাণ্ড্রেড পারসেণ্ট দেখেছি।

থামবি? জোর তাড়া মারল কাজল। চমকে উঠল পিণ্টু। ঠোঁট উল্‌টে বলল, বেশী নক্সাবাজি করিসনে কাজলা।

মনের অসোয়াস্তিটাকে দূর করবার জন্যে মান্নু তাকিয়ে থাকল জানলায়। এখন পেছনে তাকালে বোঝা যায় গাড়িটা ক্রমেই ওপরে উঠছে ঘুমের দিকে। ঘুম এ অঞ্চলের সব থেকে উঁচু জায়গা।

লোকে বলে দার্জিলিঙের চেয়েও নাকি হাজার ফিট ওপরে। নীচে অন্ধকার গভীর খাদ, পেছনে ফেলে আসা পাহাড়ের সারি। বার্চ গাছের ভূতুড়ে মাথাগুলো লেপটে আছে অন্ধকারে। ঠাণ্ডা বাড়ছে —যতই ওপরে উঠছে ওরা। মান্নু স্কাফটাকে মাথায় তুলে দিল ঘোমটার মতন করে।

—সিগারেট? সিগারেট ফুরিয়ে ফেললাম। সনৎদা, সিগারেট আছে?—ঘাড় ফিরিয়ে সনৎদার কাছে কাজল একটা সিগারেট চাইল। কাজল এক হাত বাড়িয়ে দিল সিগারেটের জন্যে, অন্য হাত দিয়ে চট করে টেনে নিয়ে গেল মান্নুর স্কার্ফটা। এক মুখ হেসে বলল, বড্ড ঠাণ্ডা মেমসাহেব।

কি সাহস! কলকাতা হলে হয়ত একটি চড় খেতে হত কাজলকে। কিন্তু এখানে মান্নু পারল না। শুধু ভুরু দুটো টান করে ও তাকিয়ে থাকল কাজলের দিকে।

ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে রইলে যে? মুচকি হেসে কাজল বলল, ঠাণ্ডা লাগলে অবশ্য শেয়ার করতে পারি।

মানে?

মানে একটা চাদর ভাগাভাগি করে দুজনে গায়ে দিতে পারি। কোন জড়তা নেই কাজলের গলায়। কিন্তু বিব্রত বোধ করল মান্নু। ওর কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। কাজল বলল, কলকাতা গেলে তো পাত্তাফাত্তা দেবে না জানি। শাড়ির আঁচলটাকে তো মুখের ওপর উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে।

কাজল! মান্নু আর থাকতে পারল না। টকটকে হয়ে উঠেছে ওর মুখ। ছি-ছি, সনৎদা যদি শুনতে পায়? সনৎদার অবশ্য তখনই মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রসংগীতের লাইন, "মেঘ বলেছে যাব যাব……।" বুদ্ধিমান লোক বটে সনৎদা। মান্নুর মনে হল। ওর গলার সঙ্গে সঙ্গে গলা মেলাল টিয়াদাও। কাজল, পিণ্টুও। কাজলের হাত সরে গেল মান্নুর পিঠের ওপর থেকে। ও মেজাজ ঢেলে গাইতে লাগল।

অলক এই গানটা খুব গায়। সুর-টুর যদিও হয় না, তবুও গায়। ওর গলায় ভুল সুরে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গাইতে আসল সুরটাই মানুর গোলমাল হয়ে যায় কত সময়। পাহাড়, আলকাতরার মতন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর উত্তেজিত মন নরম হয়ে এল। আর বিষণ্ণও। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। ঘোলাটে কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন দূরের পাহাড়গুলো দেখতে থাকল মানু। কলকাতা…অলক…। এই, তোমার চোখে জল! ছি, মেয়েরা বড় সস্তা, অল্পেই কাঁদে।

না মশাই, আর তুমি?

মোটেই না, আমাদের চোখের জলের দাম আছে। আমরা একবারই কেঁদে উঠি জন্মের সময়।—এসব তো এই সেদিনের কথা, সেদিনের ঘটনা। কত তাড়াতাড়ি বদলে যায় ছেলেরা। ওরা যুবতীর ভালবাসা চায় না, ওরা চায় শরীর। মানুর বুকের মধ্যে যেন মোচড় দিয়ে উঠল। অলকের জন্যে ওর কান্না পেল।…সোনালীটা কি বোকা। ও তো জানে না, দু-দিন বাদেই আখের রসের মতন শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দেবে অলক। ও হাসল সোনালীর পরিণতির কথা ভেবে। সোনালীর জন্যে ওর দুঃখ হল।…কিছুদিন থেকে যেন আর ভাল লাগছিল না মানুর, অলকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট-কেন্ট রাখতে। ভালবাসার মানুষ যদি মিথ্যে কথা বলে তো তার মতন দুঃখ আর নেই। অলক হচ্ছে সেই জাতের। মিথ্যে কথা বলতে ওর একটুও বাধে না। যোধপুর পার্কে ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে সোনালীর সঙ্গে দেখা করতে যায় লেকে। বলে, নোট করছিলাম লাইব্রেরীতে…। সোনালীর সঙ্গে খুব ভাবসাব চলছে আজকাল।…বাজে একটা বিশ্রী মেয়ে। শুধু বুক-সর্বস্ব যার।… মিনিস্কার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়। কলা গাছের মতন মোটা মোটা উরু।…চেহারাটাই বা কী! না আছে লাবণ্য না আছে কিছু।

কাজলরা আপন মনে গেয়েই চলছে, "দুঃখ বলে রইনু চুপে…।"

মান্নু ভ্যানিটি ব্যাগের আয়নায় দেখছে নিজের মুখ। নিজেকে তার বড় ভাল লাগে। লোকেও বলে সুন্দরী।···সোনালীটা মরবে, আর বেশী দিন নেই ওর মেয়াদ। আচ্ছা, এই মরণটা কি অলকেরও হতে পারে না! এমনও তো হতে পারে, আরেকটা ছোকরাকে পেয়ে সোনালী ওকে দিল তাড়িয়ে।···

ঢাকের বাজনা কানে আসছে। সনৎদারা গাইছে, "ভুবন বলে তোমার তরে···।" বাজনাটা ক্রমেই কাছে আসছে। পিণ্টু পরের লাইনটা গাইতে গাইতে বলে উঠল, কলকাতার কথা মনে হচ্ছে রে কাজল।—কাজল বলল, আমারও। শালা, মানিকদাটা হয়েছে এবার পাড়ার পুজোর সেক্রেটারি। ওর মুদির দোকানটাকে মনিহারী দোকান করে ছাড়বে। গাইতে গাইতে মুচকি মুচকি হাসছিল সনৎদা। কাজল বলল, সেক্রেটারি তো হবার কথা ছিল আমারই। শালা সবই আমার নসিব। তুই হলে কি করতিস?—সনৎদা বলল। কাজল বলল, বেশী কিছু নয়, একটা টেরিলিনের স্যুট। —হাঃ হাঃ হাঃ, গান থামিয়ে হাসতে লাগল ওরা। টিয়াদা বিরক্ত হয়ে বলল, আরে দূর, দূর, গানের মধ্যে কথা বললে কি আর গান-ফান জমে?—ফোড়ন কাটল সনৎদা। বলল, আবার সে গান যদি হয় রবীন্দ্রসংগীত।

রবীন্দ্রসংগীত গাওয়াটা তো আজকাল একটা ফ্যাশান। বিয়ে-বাড়ির মাইক থেকে শুরু করে পুজোর প্যাণ্ডেলে, এমন কি হিন্দী গানের সঙ্গে পর্যন্ত সমান তালে চলে রবীন্দ্রসংগীত।—ব্যঙ্গ করল মান্নু।

ঠিক তাই।—কাজল আরও ব্যঙ্গ করে বলে উঠল। মান্নু উত্তেজিতভাবে বলতে থাকল, বখাটে রকবাজ ছোকরাগুলো পর্যন্ত অশ্লীল গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত গায়।

আর বখাটে মেয়েরা বুঝি গায় না?—পিণ্টু বেশ খানিকটা ক্ষেপে উঠে বলল। মান্নু অবশ্য আমল দিল না ওকে। ও বলতে লাগল, বোমা বানিয়ে মাস্টারদের ঠেঙিয়ে যারা বিপ্লবের কথা বলে,

গুরুজন মানে না, মেয়েদের সঙ্গে যা-তা ইয়ে করে, সেই সব রকবাজ বদমাশরাও আবার রবীন্দ্রসংগীত গায়।

আই অবজেক্ট।—রাগে ফেটে পড়ল পিণ্টু। কিন্তু কাজল মুখ টিপে হাসছে তখনও।

পিণ্টু গাড়ির সীট চাপড়ে বলে উঠল, বুর্জোয়া শিক্ষা যারা দেয়, সেই সব মাস্টারদের ঠেঙানোই ভাল। শালা, এম-এ, বি-এ পাস করিয়ে কি লাভটা হচ্ছে? মাটিকাটার কাজও তো জুটছে না।

কাজল খুব আস্তে বলল, চুপ করবি পিণ্টু? এটা কি মনুমেণ্টের তলা পেয়েছিস? রবীন্দ্রসংগীত কারও বাপের সম্পত্তি নয়, বলে দে। রবীন্দ্রসংগীত আজ সবাই গাইছে বলে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে যাচ্ছে।—গজর গজর করতে লাগল কাজল।

মানু আর কথা বাড়াল না। নিজেকেই ওর বেরসিক মনে হল যেন। এই সস্তা কতগুলো ছেলের সঙ্গে মিশছে বলে। কেন যে ছাই দার্জিলিং এসেছিল। পুজোর ক'টা দিন কলকাতার ঘরে বসে কাটিয়ে দিলেই চলত। অসংখ্য শারদীয়া পত্রিকার ভিড়ে মনে হয় সময়টা খারাপ কাটত না। কিন্তু কলকাতা যে অসহ্য…।

লেকের অন্ধকারে জড়াজড়ি করে বসেছিল যেন কারা। চেনা চেনা লাগছিল মানুর। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে গিয়েও অলক বলে ডেকে উঠেছিল। মাত্র একবার পেছন ফিরে তাকাল যুবকটি। তারপরই ছুটে পালাল ওখান থেকে। পরদিন দেখা হলে স্রেফ অস্বীকার। বলল, আরে দূর দূর, আমি হতে যাব কেন? একই চেহারার কি দুটো লোক হয় না?

হয়। কিন্তু আমার চোখ বলছে অন্য কথা।

ফাঁকি দিতে পারল না অলক। হাসল। বলল, যদি আমিই হয়ে থাকি তো দোষটা কোথায়? উদার হও, বুঝলে?

ও-সব উদারতা-ফুদারতা আমার নেই।—মানু বলল।

আমার জীবনে তোমাদের দু'জনেরই ভূমিকা আছে। ভাল-

বাসার কি এক রূপ ? আমি কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করব না।

অবশ্য বিয়ে আমি তোমাকেই করব। ও দেখতে ভাল না। কুৎসিত।

অসহ্য।—মান্নু ঠাস করে অলকের গালে মারল একটা চড়। আশ্চর্য ! এর পরেও অলকের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। দেখা হয়। কিসের যেন একটা আকর্ষণ। অথচ ভেতরটা জ্বলে যায়।—

কি মেমসাহেব, চটলে নাকি ?—কাজল সহজ হতে চাইল মান্নুর কাছে। ইয়ার্কির ঢঙে বলল, আরে হামলোক তুমহারা দোস্ত।

মান্নু যেন শুনেও শুনল না। তারপর পেছন ফিরে কাজল সনৎদার দিকে তাকিয়ে বলল, মাল-ফাল না হলে আর জমছে না দাদা। আমার ব্যাগে হুইস্‌কি আছে, চলবে ?

চালাও হে। এখানে সবাই ফ্রেণ্ড।—ঝরঝরে হাসি হাসল সনৎদা। ওকে জড়িয়ে ধরে পিণ্টু গলা ফাটিয়ে বলে উঠল, গুরুদেব লোক বটে আপনি সনৎদা। একটা হুইস্‌কির বোতল বার করল কাজল, আর একটা সোডা। গ্লাসে ঢেলে সোডা মেশাতে মেশাতে বলল, মেমসাহেব, কোনদিন টেস্ট-ফেস্ট করেছ নাকি ? আজকাল মেয়েরা তো এ সব খায়-টায়। খেলে খেতে পার, এ খাঁটি বিলিতী মাল, যদিও পকেট গড়ের মাঠ হলে আমাদের বাংলাও চলে। বাংলা ধেনো !

ধেনো, স্রেফ ধেনো।

মান্নুর ঠোঁটে এক টুকরো বাঁকা হাসির রেখা খেলে গেল। কাজল ওকে বাংলা শেখাচ্ছে। এ সব কথা অলকের মুখে ও তো কতদিন শুনেছে। কলকাতার ছেলেদের এখন লেটেস্ট ফ্যাশান হচ্ছে বাংলা অর্থাৎ ধেনো। অলক অবশ্য মা-কালী বলে, বাংলা বলে না। ও নাকি ওসব খায়-টায় না। যারা খায় অলক তাদের ঘেন্না করে। ও বিলিতী খায় মাঝে মাঝে, কোন বড় রেস্তোরাঁয় বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়লে। তবুও ওর গায়ে কোন কোন দিন পচা গন্ধ

পায় মান্থ। গন্ধটা মান্থর খুব চেনা। ওদের বাড়ির কয়লাওলাটা যেদিন মাতাল হয়ে আসে, সেদিন তার গায়ে ঠিক ওই গন্ধটাই ভুরভুর করে। অলকের গায়ের গন্ধটা যে কিসের মান্থ তা জিজ্ঞেস করে না। ও জানে, জিজ্ঞেস করলেই তো মিথ্যে শুনতে হবে।

এঁকে-বেঁকে চলছিল গাড়ি। আগের দিন বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় রাস্তাটা একটু পেছল। হয়ত সামান্য ধ্বস নেমেছিল। কাদার গোলা আর পাথরের নুড়ি ছড়িয়ে রয়েছে কোথাও কোথাও। হয়ত কোন দুর্ঘটনা ঘটবে। মান্থর বুকের মধ্যে বাজতে লাগল কথাটা।

এক-একটা ঝাঁকুনিতে সরে সরে আসছে কাজল। মান্থর বুক উরু স্পর্শ করছে। ভয়, বিরক্তি এবং ঘেন্নায় মরে যাচ্ছে মান্থ। কে জানে, কাজল ইচ্ছে করেই করছে কিনা। ওর ভারী গরম নিঃশ্বাস এসে পড়ছে মান্থর গালে, কানের লতিতে।

আহ্, আহ্, বিউটিফুল।—আঙুলে তুড়ি মেরে বলে উঠল কাজল। বলল, কী বিউটিফুল সীনারি মাইরি। ফেরার পথে একটা স্ন্যাপ নিতে হবে ঠিক এইখানের।

পিণ্টু বলল, শালা, ফিল্ম কোথায়? দাস স্টুডিও থেকে কাল অতগুলো ফিল্ম কিনলাম, সব শেষ।

সে কি রে।—এক ঢোঁক মদ গিলে কাজল বলল।

পিণ্টু বলল, সে কি রে মানে? কাল যে-হারে ছবি তুলেছিস নেপালী মাইকিটার।

যৌবনের যা দেমাক দেখলাম, না তুলে কি পারি?—কাজল বলল।

টিয়াদার বোধ-হয় নেশা ধরে আসছিল। চেঁচিয়ে বলল, সাট আপ্। ও-সব বাজে বুকনি ফের যদি···সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে না?

জোরে হেসে উঠল ওরা। এমন কি টিয়াদাও। তারপর হঠাৎ হো হো, হি হি হাসির ধুম পড়ে গেল। ওরা কি সব মাতাল

হয়ে গেছে ? আড়ষ্টভাবে বসে রইল মান্নু। এক দিকে ওয়াংগালের পোড়া চুরুটের গন্ধ, অন্য দিকে চারটে মাতালের হট্টগোল, মদের উগ্র গন্ধ। গাটা যেন গুলিয়ে উঠল মান্নুর। যদিও জীপের খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে হুড়হুড় করে বাতাস আসছিল, তবুও। ও চোখ বুজল। কিসের যেন একটা অভাববোধের যন্ত্রণা ওর বুকের মধ্যে। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটা ব্যথা। ওর গলাটা আটকে আসছিল। নিজেকে ওর অসহায় লাগছিল। মান্নুর কান্না পাচ্ছিল। ওর প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে কবছিল। কিন্তু ও পারছিল না।

চোখ খুলে কাজলকে দেখল মান্নু। কত অল্পে খুশী এরা। উফ্, আমি, আমি কেন পারছি না, এদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে ? তা হলে আমার কোন যন্ত্রণা থাকত না, কোন দুঃখ না।··· আমি যেন দেওয়াল তুলে রেখেছি। আমার চারদিকে উঁচু উঁচু দেওয়াল। সেখানে কেউ ঢুকতে পারছে না। বেরুতে পারছি না আমিও। তাই আমাব মনে এত ক্ষোভ, এত যন্ত্রণা।—মান্নুব মনে হল, সব ভেঙে যাক, গুঁড়িয়ে যাক এই দেওয়াল। মনে হল ওর, আমি সোনালীর মতন সস্তা হব, আমি অলকের মতন হব, আমি কাজল হব।

জয় মা কালী, হয় না যেন বোতল খালি!—কাজল চেঁচাল বোতলের শেষ তলানিটুকু গলায় ঢেলে। পিণ্টু গাইল, 'আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না'···

সনৎদা বিকৃত গলায় ধরল তার পরেব লাইন। কাজল দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল, লড়াই করে বাঁচতে হবে।—পিণ্টু বলল, এ দাবি বাঁচার দাবি···

টিয়াদা হাসছে। সনৎদা গেয়েই চলেছে সেই একই লাইন। হয়ত ও আর জানে না বাকিটা।

আরও খারাপ রাস্তার চড়াই ভেঙে উঠতে লাগল গাড়ি। জীপের একটানা আওয়াজ গোঁও—গোঁও—। সামনে-পেছনে অনেক

গাড়ির সারি। ওই একই আওয়াজে বাঁকের পর বাঁক নিচ্ছে তারাও। নীচে শত শত মাইল গভীর খাদ। সবাই হঠাৎ চুপ মেরে গেল। মান্নুর মুখে আতঙ্কের ছাপ। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে? ওদের মনেও আতঙ্ক, মান্নু বুঝতে পারল। ওদের কি জ্ঞানগম্যি বলে কিছু আছে এখনও! থমথমে, অস্বস্তিকর হয়ে উঠল আবহাওয়া। চুপ করে থাকতে থাকতে সনৎদা একসময় বলল, মান্নু রে, কেমন লাগছে বল ত? মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধের গাড়ি, তাই না?

মান্নু বলল, আমি তো যুদ্ধ দেখিনি।

যুদ্ধের গাড়ির আওয়াজ এমনিই হয় বটে।—সনৎদা ভারিক্কী চালে বলল। হাসি পেল মান্নুর। ও তো জানে যুদ্ধ-টুদ্ধ সনৎদাও দেখেনি, স্রেফ গুল মাবল। হয়ত এই স্তব্ধ মুহূর্তকে কাটানোর জন্যেই।

কাজল একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে চলছে। কয়েক পেগ্ হুইস্‌কিতে ওর কিছুই হয়নি।

পিণ্টু গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল: কি রে কাজলা, কিছু বল? অনেক নকশা তো এতক্ষণ দিলি মাইরি।

আর তুই দিসনি?—কাজল রুক্ষ গলায় বলে উঠল পিণ্টুকে।

মান্নু শুকনো গলায় বলল ওয়াংগালকে, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে না তো শেষ পর্যন্ত?

ওয়াংগাল তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। ও এক হাতে চুরুট, অন্য হাতে স্টিয়ারিং ধরে যেমন গাড়ি চালাচ্ছিল, ঠিক তেমনিভাবেই চালাতে চালাতে বলল, মো বিশ বরষসন গাড়ি চালান দাইছু, কি কো ডরছ?

কথা শেষ করতে না করতেই জোরে ব্রেক কষল ওয়াংগাল। প্রচণ্ড জোরে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে পড়ল গাড়ি। ছিটকেই হয়ত পড়ত ওরা। কিন্তু জীপের ঝোলান বেল্ট্ আর সীট ধরে বেঁচে গেল কোনরকমে।

কি হল ? কি হল ? বলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ওরা। ওয়াংগাল নির্বিকারভাবে বলল, সামনামা কোই গাড়ি বিগড়ে কোছওলা।

ওরা দেখল সামনের-পেছনের অগুনতি গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে গেল পর পর। নিবে গেল গাড়ির হেডলাইটগুলো। মানুদের গাড়িটা আটকে রইল সব থেকে ঢালু জায়গায়।

দূরে পাহাড়ের মাথায় দেখা যাচ্ছে নীল একটা আলো। সনৎদা উৎসাহিত হয়ে উঠল আবার, আমরা প্রায় এসেই গিয়েছি।' —বলল সনৎদা, ওই তো টাইগার হিলের মাইক্রোওয়েভের সিগন্যাল ল্যাম্পের আলো।

কিন্তু কোন উৎসাহই নেই কারো।

এভাবে ব্রেক কষে কতক্ষণ বসে থাকবে ড্রাইভার! বরং আমরা এগোই। অনেকেই তো হাঁটছে দেখছি।—কাজল বলল। সায় দিল ওরা সবাই।

মানু নামল প্রথমে, তারপর কাজল। সনৎদার টর্চটা যেন কোথায় গড়িয়ে পড়ল। অন্ধকারে অনেকক্ষণ হাতড়াল সনৎদা। না পেয়ে শেষে বলল, তোরা এগো, আমি আসছি।

পর পর থেমে থাকা গাড়িগুলোর পাশে সরু একফালি পথ। নীচে খাদ। পাশাপাশি দুটো মানুষ হেঁটে যাবার মতন রাস্তাও নেই। বাতাসের ধার বেশ জোরাল। অনেকের গায়েই কম্বল-টম্বল জড়ান। কান মাথা বেশ করে ঢাকা। তবু দাঁতে দাঁত লাগছিল ওদের। ঠাণ্ডায় ওরা কাঁপছিল। ওরা চলছিল লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকা জীপের শরীর ধরে ধরে! হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল ছোট মাপের একটি মানুষ, হয়ত কোন বাবার কোল থেকে। কান্না থামানোর জন্যে বাবা বললেন, চুপ কর, চুপ কর, ওই ছাখ সূয্যিমামা।

হেসে ফেলল অচেনা সব মানুষগুলো। ওদের হাসাহাসি, মৃদু সুরের কথাবার্তা সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত পরিবেশ যেন

সৃষ্টি হয়েছিল তখন।

জীপের লাইন শেষ হল। কাজল বলল, ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কেটে গেল মেমসাহেব।

এবার পথটা একটু চওড়া। মান্নুর পাশে পাশে চলছিল কাজল। দলের আর সবাই কে কোথায় কেউ জানে না। অজানা কোন এক ইংরিজী গানের সুরে শিস দিতে দিতে চলছিল কাজল। মুখে মাঝে মাঝে উচ্চারণও করছিল তার লাইন, আই লাভ হার, লাভ হার, লাভ হার, লাভ হার সো উইল ইউ…

তারপর গাইতে গাইতে এক সময় বলে বসল, আমি কোনদিন কাউকে ভাল-টাল বাসিনি, কিন্তু তোমায় আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করছে মেমসাহেব।

হাসল মান্নু। কথাটা ওর নাটুকে নাটুকে লাগল। বলল, এর আগে এ কথা আর কতজনকে শুনিয়েছ?

অনেককে।—সহজ স্বাভাবিকভাবে বলল কাজল। বলল, অনেককেই আমি চুমু-টুমু খেয়েছি। কিন্তু ভালবাসতে পারিনি। ভালবাসা বলে আজকাল আর কিছু নেই।—কথাগুলো বলেই আবার শিস দিতে লাগল কাজল।

মান্নু যেন অবাক হয়ে দেখল কাজলকে। মনে হল ওর, ছেলে জাতটাই কি এমন? ভালবাসা ওদের নেই কেন? ওরা অগভীর হালকা বলে!

কাজল বলল, মেমসাহেব, জীবনটাকে চেখে চেখে দেখছি। কিছু ভাল লাগে না। কিস্স্যু না। বোমা মেরে দেখলাম, চাকু মারলাম। ছিনতাই? তাও করলাম। হাজতবাস করলাম কত বার। মেয়েদের সঙ্গে একটু ইয়ে-টিয়ে করেও দেখলাম, কিছু ভাল লাগে না। তাই এখন গাঁজা টানছি, ভাঙ টানছি আর বাপ-দাদার পকেট মেরে কোন-রকমে টু পাইস জমিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই তো সেদিন ঘুরে এলাম ছোটনাগপুরের জঙ্গল থেকে, শুনেছিলাম ওখানে

নাকি ভাল মহুয়া পাওয়া যায়।—কাজলের গলার স্বরে হতাশা ফুটে উঠল যেন। মদের ঝাঁঝ আসছিল ওর গা থেকে।

মান্নু বলল, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে গিয়েছিলে কেন? হিপিরা যায় বুঝি?

মোটেই না, বলিষ্ঠ সুরে কাজল বলল, ওখানে আমি একটা হিপিকেও দেখিনি।

ব্যঙ্গের সুযোগ পেল মান্নু। বলল, কি জানি, আমি তো ভাবলাম তাই। কান পর্যন্ত টানা লম্বা জুলপী, অদ্ভুত রকমের সাজ-পোশাক আর নানা বদ্‌খেয়ালের বহর দেখে আমার তো মনে হয় হিপিদেরই নকল করার সাধ তোমাদের।

আমি কারো নকল করে চলি না মেমসাহেব। এ সব পোশাক পরলে আমায় ভাল দেখায়, তাই পরি। কেন, আমার চেহারাটা কি খারাপ?—গলার সুর পালটে হাসল কাজল। বলল, আমি কবিতা পড়ি। টি এস এলিয়ট আমার হাতের মুঠোয়, কিন্তু কোন হিপির হাতে তো আমি কোনদিন কবিতা-টবিতা দেখিনি।

কবিতার বই হাতে রাখাটা একটা ফ্যাশান।—মান্নু বাধা দিল ওর কথায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে কাজল বলল, হতে পারে, দেখেছ আমাদের ফ্যাশানটাও কত সিরিয়াস? হিপিরা আমাদের মতন অতো সিরিয়াস নয়।

অসহ্য লাগছিল মান্নুর কাজলের এই দম্ভ। কিন্তু ওর কথা শোনার কৌতূহলটাও যেন একেবারে দূর করতে পারছিল না মান্নু।

কাজল বলল, আসলে কি জানো মেমসাহেব, যা-কিছু কনভেনশন বা রীতি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আমরা। গুরুফুরুজনের কথা তাই আমরা অগ্রাহ্য করি, কারণ ওঁরা পুরোনো নীতির বুলি আওড়ান। শ্রদ্ধা, ভালবাসা কোন কিছুকেই আমরা আর বিশ্বাস করি না। আমরা কাউকেই কেয়ারটেয়ার করি না। নট্ ইভন মাই ফাদার।

—কথা বলতে বলতে কাজল প্যাণ্টের পকেট থেকে বার করল একটা ছুরি। তার বোতাম টিপতেই সড়াৎ করে বেরিয়ে এল ধারালো ফলাটা। কাজল বলল, ইচ্ছে করলে তো তোমার কাছ থেকে এখন জোর করে আমি কিছু আদায় করতে পারি? এটাই কিন্তু আমার চরিত্র মেমসাহেব।

শিউরে উঠল মানু। ধড়াস করে উঠল ওর বুক।

কাজল হাসল। বলল, ভয় পেলে? মেমসাহেবদের নকল করে প্যাণ্ট পরেছ, অথচ ওদের মতন সাহসী হতে পারনি!—তীব্র বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল কাজলের গলার স্বরে।

মানুর মনে হল, ওর গালে এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিল যেন কাজল। তবুও ও বলল, তোমাব মতন সস্তা ছেলে ভয় দেখিয়ে কিছু আদায় করবে, সে আর নতুন কি?

সস্তা ছেলের ছককাটা জীবনে চলতে আমি অভস্ত নই। কিন্তু ইচ্ছে হলে এ কাজ আমি করতে পারতাম।—হা হা করে হাসল কাজল। বড় বেপরোয়া সে হাসি।

রাস্তাটা ক্রমেই ওপরে উঠছিল। হাঁফাচ্ছিল মানু। শরীরে আর জোর নেই। ওর মনও যেন ক্লান্ত। কিন্তু শিস দিতে দিতে ধীরে ধীরে উঠছিল কাজল। ওর যেন ক্লান্তি নেই, স্বতঃস্ফূর্ত যৌবন ওর দেহে মনে। পাতলা হয়ে আসছিল অন্ধকারের আবরণ। দূরে পাহাড়ের গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আলো। ওদিকে কার্শিয়াঙ্।

ওরা পৌঁছুল টাইগারহিলের উঁচু মাথাটায়। সেখানে তখন বহু সিজনারের ভিড়। আবছা অন্ধকারে কারো চেহারাই খুব স্পষ্ট নয়। শুধু শুনতে পাচ্ছিল মানু, নানা দেশের নানা ভাষার আলাপ, প্রলাপ, চাপা হাসি। কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ইংরেজের সঙ্গে আফ্রিকান, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের অধিবাসী। মানু দেখলে,. ব্যালকনির মতন খোলা রেলিঙ দিয়ে ঘেরা দোতলা বাড়িটায় হরেক রকম মানুষ। ওদের

সবার চোখই একদিকে, পূব দিকটা লাল হবে কখন ?

ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ ডেকে উঠল সনৎদা—কাজল, পিন্টু, টিয়া তোরা এগিয়ে আয়। পিলারটা ধরে রেলিঙের ওপর উঠে দাঁড়া, ভাল দেখতে পাবি।

ভিড় ঠেলে ওদের সঙ্গে সঙ্গে মানুও এগিয়ে এল। সনৎদা দু' হাত তুলে বলল, উঁহু, তুমি না, তুমি না, লেডিজ নীচে দাঁড়াও।

বাঁদিকের পাহাড়গুলো তোরা লক্ষ্য করিস।—সনৎদা বলতে থাকল, প্রথমে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তারপর থ্রি সিস্‌টারস, আর তারপরই এভারেস্ট। থ্রি সিস্‌টারস মানে বুঝলি তো ?—সনৎদা মানুর দিকে তাকাল। ওরা মাথা নাড়ল। সনৎদা বলে চলল, নন্দাদেবী, ধবলগিরি আর ত্রিশূল। সূর্যের রঙ বদলের সঙ্গে সঙ্গে এদের রঙও বদলায়। ওই বরফের পাহাড়গুলোকে তখন ঠিক চুনের পাহাড়ের মতন দেখায়।

চুনের পাহাড় ?—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল কাজল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, চুনের পাহাড়। সেকালের কবিরা বলেছেন রজতপুত্র, একালের কবিরা বলবে চুনের পাহাড়।—হাসতে লাগল সনৎদা। দলের আর সবাইও হেসে ফেলল হো হো করে।

মানু এসে দাঁড়াল কোণের দিকের ফাঁকা এক ফালি জায়গায়। সবার থেকে নিজেকে ও আড়াল করতে চাইছিল যেন। ও নির্জনতা খুঁজছিল। কিন্তু কোথায় নির্জন ? চারদিকে মেলার মতন শুধু মানুষ, মানুষের মাথা।

মানুর একটা নেশা ছিল, ছেলেবেলায় বায়স্কোপ দেখার নেশা। টিনের বাক্সের মধ্যে হরেক রঙের ছবি রেখে তার মুখে পুরু কাঁচ লাগিয়ে খেলা দেখত মানু। ছোট ছবি বড় হয়ে যেত। ওর সেই খেলাটাই মনে পড়ল আবার। ও পকেট থেকে বার করল বায়নোকুলার। তার মধ্যে দিয়ে মানু আকাশ দেখতে লাগল। ভোর রাতের শিশির ভেজা বাতাসে সিরসির করছিল শরীর। দূরবীনের

মধ্যে দিয়ে আকাশ দেখল, পাহাড় দেখল মানু। তারপর অন্য-মনস্কভাবে মানুষের মুখে দূরবীন ফেলল কেন যেন।

ওদিকে সূর্য উঠছে। পূব আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে কমলালেবুর গাঢ় রঙ। দু' পাশে মহাসমুদ্রের মতন নীল পাহাড়। মাঝখানে থিরথির করে কাঁপছে কমলা রঙের গোল একটা বিন্দু। আর দাগ কেটে কেটে ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে ওই রঙের অসংখ্য রেখা। লাল, হলদে, বেগুনী—থ্রি সিসটারসের রঙ বদলাচ্ছে, রঙ বদলাচ্ছে কাঞ্চন-জঙ্ঘা, এভারেস্টেরও। উল্লাসে ফেটে পড়ছে হরেক রঙের বড় মাপের মানুষ। ওরা ঘন ঘন সাটার টিপছে ক্যামেরার।

বাহ্ বাহ্, ফাস্ট কেলাস্।—পিণ্টু চেঁচিয়ে বলল। চেঁচিয়ে উঠল সনৎদা, টিয়াদা—আগুন, আগুন লেগেছে রে।

চেঁচিয়ে উঠলেন কোন দিল্লিওয়ালী,—আহারে আগ্ লাগা দিয়া কৌন।—দূরবীনের মধ্যে দিয়ে মানু দেখছে কাজলকে। ওর সারা কপালে এলোমেলো চুল। ওর নেশাধরা লাল চোখ। চোখের কোণে কালির প্রলেপ। হয়ত কত রাত জাগার চিহ্ন। ওর পানখাওয়া ছোপধরা ঠোঁটে ফুটে উঠছে ভালবাসার হাসি।

খুশি হতে পারছে না মানু। বুকের মধ্যে সেই যন্ত্রণার পোকাটা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে যেন। মনে হচ্ছে সব অভিনয়। তবুও নেশার মতন লাগছে বায়স্কোপের ছবি। ও অনুভব করছে ছেলেবেলার সেই মনটা আব নেই, মরে গেছে কবেই।

তোমার ঠিকানায়

ফ্ল্যাটটা দারুণ পছন্দ হয়েছিল ঝিলিমিলির। ছোট্ট ছিমছাম ফ্ল্যাট, আগাগোড়া মোজাইক। একটা বেডরুম, একটা ড্রইং রুম, ডাইনিং স্পেস, একটা কিচেন। বেডরুমের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম। একেই বলে বোধহয় আমি-তুমি সংসার। সামনেই সুন্দর রেলিঙ দেওয়া বারান্দা।

মনের মতন করে ফ্ল্যাটটা সাজিয়েছিল ওরা দুজনে, ঝিলিমিলি আর দীপন। ওরা ভুলে গেছিল নিঝুমপুরের বাংলো বাড়ির শোক। যে বাড়িতে অনেক ঘর, অনেক বাথরুম, প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড জুড়ে ফুলের বাগান। দীপন বলেছিল, কলকাতা, কলকাতা, তুমি ভুলে যাও ঝিলিমিলি নিঝুমপুরের কথা। কত কষ্ট করে এই ফ্ল্যাটটা জোগাড় করেছি বল তো? দু'মাস ধরে সারা কলকাতা তছনছ করে শেষ পর্যন্ত এই ফ্ল্যাটখানা। এর নাম কলকাতা। একি তোমার নিঝুমপুরী যে পেল্লাই সব বাড়ি দিয়ে দেবে সামান্য টাকায়। কোম্পানী বাড়িও করেছিল সব। আটখানা ঘর দুটো মানুষের সংসারে। একেবারে যেন রাজরাজত্বি।

সত্যিই তো, কলকাতায় বাড়িভাড়ার সমস্যা কি সেটা একেবারে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল ঝিলিমিলি। আটখানা ঘরের মধ্যে ছড়ানো ওদের মুক্ত মনটাকে দু'খানা ঘরেই সীমাবদ্ধ করে ফেললো ওরা। এটা তো নিঝুমপুর নয়, একটা কলকাতা। এখানে বাড়ি দিয়ে কি হবে? এখানে কেউ তো আর বাড়ি দেখতে আসে না। নিঝুমপুরের মতন কে কোন বাড়িতে বাস করে তাই নিয়ে কারো মাথাব্যথাও নেই। স্রেফ থাকা-খাওয়ার জন্যে একটু জায়গা দরকার।

বড় জগতের জন্যে তো দরজার বাইরে বিরাট পৃথিবী রয়েছে। ট্রাম, বাস, অজস্র পথঘাট, সিনেমা, থিয়েটার, চাইনীজ রেস্তোরাঁ কি না চাই? ওরা কদিন ডানা মেলে উড়লো। কপোত-কপোতীর মতন রাতে নীড়ে ফিরে এলো। ঠিক বিয়ের পরের দিনগুলোর মতন ওরা আবার নতুন হল। একজন আর-একজনকে ছাড়া চলে না। একজন আর-একজনের কথায় ওঠাবসা করে। বড় পৃথিবী ওদের মনটাকে উদার করে দিল। নিঝুমপুরের শাল পিয়ালের জঙ্গলও যা পারেনি।

সেই বড় পৃথিবীও ছোট পৃথিবী হয়ে গেল, যখন কদিন পরই দীপন বললো, কোম্পানী তাকে পাঠাচ্ছে বিহারে। শহর ছেড়ে অনেক মাইল দূরে এক অখ্যাত জায়গায়। তবে মাত্র বছর-খানেকের জন্যে। এই ফ্ল্যাট ফেলে ঝিলিমিলি যাবে কি করে? চুরির ভয় রয়েছে। তাছাড়া মাত্র এক বছরের জন্যে যাওয়া। এক বছর বাদেই তো আবার সেই কলকাতা। ছোট্ট টুম্পা সবেমাত্র স্কুলে যেতে শুরু করেছে। ওরও তো বিরাট ক্ষতি। অতএব ঝিলি-মিলিকে এখানেই থাকতে হবে, দীপন একাই যাবে। ঝিলিমিলির মাথায় বাজ পড়লো। ও অসহায়ের মতন বললো, একা থাকবো কি করে?

দীপন বললো, একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

ওরা যখন নিঝুমপুরে ছিল, তখন দীপন একদিনের জন্যে বাইরে গেলেও হাঁপিয়ে উঠতো ঝিলিমিলি। একা একা কি থাকা যায়? আর সেখানে দীপন এক বছর থাকবে না! প্রথমেই প্রশ্ন তুললো ঝিলিমিলি নিরাপত্তার, তারপর শূন্যতাবোধের।

দীপন বললো: কত মেয়ের কত স্বামী তো ফরেনেও চলে যায়। কত বছর, কত মাস একা থাকে তারা। আর তুমি মাত্র একটা বছর পারবে না? দেখবে, একা থাকতে থাকতে ঠিকই অভ্যস্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া, আমি তো মাঝে মাঝে আসবো।

দীপনের কথাই ফলে গেল। ঝিলিমিলি অভ্যস্ত হয়ে গেল একক জীবনে। বাজারহাট, দোকানপাট, বাড়িভাড়া, ইলেকট্রিক বিল, ছেলের ইস্কুল সমস্তই তার একটা মাথায় জায়গা পেয়ে গেল।

মাঝে মাঝে দীপনের চিঠি আসে। বিহারের সেই অখ্যাত জায়গার গেস্টহাউস থেকে দীপন লেখে, তুমি আমার ওপর বড় বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলে। এতে তোমার আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়েছিল। কিছুদিন তোমার একা থাকা দরকার। বিদেশী মেয়েদের দিকে তাকিয়ে ছাখো। আমি চাই, আমার বউ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হবে। চিঠি পড়ে ঝিলিমিলি হাসে। ও ভাবে, দীপন এবার এলে ঠিক অবাক হয়ে যাবে, ঝিলিমিলির সংসারে গেস্টের মতন যখন থাকবে।

দরজায় একটা নেমপ্লেটও লাগিয়ে দিযে গেছিল দীপন ঝিলি-মিলির নামে। আপত্তি করেছিল ও। বলেছিল, এর কি কোন দরকার আছে?

দীপন বলেছিল, হতেও তো পারে, আমি যখন থাকছি না এখানে, তখন তোমার তো আলাদা পরিচয় থাকবে। এটা আন্ত-র্জাতিক নারীবর্ষ। স্বামীর পরিচয়ে স্ত্রীর পরিচয় নয়।—কথাগুলো বলে দীপন হো হো করে হেসেছিল।

নতুন পরিচয় নিয়েই বাঁচতে লাগলো ঝিলিমিলি। দীপনের অভাবে প্রথমে মরুভূমির মতন মনটা খাঁ খাঁ করতো। সংসারের যা কিছুই করতে চায় সব কিছুতেই একটা অদ্ভুত শূন্যতা। দীপনের জন্যে কত রাতে ঘুম আসতো না। টুম্পাকে বুকে জড়িয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকতো বিছানায়। ও নিঝুমপুরের স্মৃতিচারণ করতো, যেখানে সেই বাংলো বাড়ির কোন এক শয়নকক্ষে এই মা আর ছেলের সঙ্গী ছিল দীপন রায়। সেখানে ছেলের প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো তাকে, ঠাকুর কোথায় থাকে পাপা? তিক্তিকি ঘরে থাকে, কুমীর জলে থাকে কেন?

দীপনের হাসির সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসতো ঝিলিমিলি। ছেলের প্রশ্নের উত্তর দিতে না দিতেই মায়ের প্রশ্ন, আজ এতো দেরী করে ফিরলে যে?

কাজ ছিল।

বাজে বকো না। আমি জানি, তুমি আজ তাসের আড্ডায় গিয়েছিলে। কথা ছিল মার্কেটিং করবে। আমি এদিকে তৈরী হয়ে…।

তুমি একা গেলেই তো পারতে।

না বাবা, ওই দেহাতীদের ভিড়ে…। থাক, আমার মার্কেটিঙে দরকার নেই। সংসার কি আমার একার?

এ-সব কথা প্রথম প্রথম মনে হতো ঝিলিমিলির। সেই মার্কেটিঙেই এখন ওকে একা বেরোতে হয়, যা ওর কাছে দারুণ বিরক্তিকর। যদিও এখানে দেহাতীদের ভিড় নেই।

নিঝুমপুরের সকাল হতো সাইরেনের আওয়াজে। চোখ মেলেই ধড়ফড় করে উঠে বসতো ঝিলিমিলি। হাজার বার দীপনের চা করে দাও। এটা সেটা ফাইফরমাশ খাটো। কাজের লোকের কোন কিছু করা তার পছন্দ নয়। বউকে সে খাটাবেই। এর মধ্যে চাকর-বাকরকে দিয়ে ঘরদোর সাফ করানো। বাবার মতন ছেলেও ঠিক তেমনি জ্বালাবে। কাজের লোকের কাছে খাবে না। মা ছাড়া তার কিছুই হয় না। অতএব টুম্পাকে খাওয়াতে খাওয়াতে দীপনের ব্রেকফাস্ট তৈরী করা, সোফেয়ারকে দিয়ে গাড়ি পরিষ্কার করানো, ঝাড়ুদার, জমাদার ইত্যাদি ইত্যাদি বিরাট ব্যাপার। কিন্তু এখানে সেই বড় বাড়ির বড় ব্যাপার নেই। বাড়ির মালিকের ফাইফরমাশ নেই। অতএব অফুরন্ত অবসর। ঝিলিমিলির সকাল হয় আজকাল সাড়ে সাতটার পর। ছেলের ইস্কুল দুপুরে। তাই ওর সকালটা একেবারেই বেকার।

শুধু ছেলেকে নিয়েই যা একটু ব্যস্ততা। খাওয়া নিয়ে বড্ড

ভোগায় টুম্পা। তাকে খাওয়ানোটাই এক ঝকমারি ব্যাপার। নিঝুমপুরে ওকে খাওয়াতে গিয়ে সময় নষ্ট হতো বলে ঝিলিমিলির বিরক্তির শেষ ছিল না। কিন্তু এখন এই ব্যস্ততাটুকুই যেন ভাল লাগে। তবু ও তো একটা সঙ্গী। কখনো তার সঙ্গে বল খেলতে হয় ঝিলিমিলিকে, কখনো ক্রিকেটের ব্যাট হাতে করে দাঁড়াতে হয়। নিঝুমপুরে থাকতে টুম্পার খেলার সঙ্গী হতে হয়নি তাকে। দীপন ছিল শ্রীমানেব খেলার পার্টনার, বেড়ানোব সঙ্গী। টুম্পার কৌতূহলী মনের অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিতো। আর ঝিলিমিলি মা তাকে ঘুম পাড়াতো গান গেয়ে গেয়ে, তাকে রূপকথার জগতে নিয়ে যেতো পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়ে। বনের মধ্যে পথ-হারানো ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের শিকার হয়ে যেতো কখনো মা। তখন তাকে বাঘের ডাক ডাকতে হতো, হায়নার হাসি হাসতে হতো।

আধো আধো গলায় দীপন পাপাকে ফোন করতো টুম্পা, যেদিন তার অফিস থেকে ফিরতে দেরী হতো।

এখন ঝিলিমিলি মাকে দ্বৈত ভূমিকা করতে হয়, কখনো বাবার, কখনো মায়ের। ঝিলিমিলি বুঝতে পারে, মা কি কখনো বাবা হতে পারে? ঝিলিমিলি যখন ক্রিকেটের ব্যাট ধরে, যখন বোলিং করে নিতান্ত আনাড়ীব মতন, ছোট্ট টুম্পা তখন হেসে ফেলে। হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ে। তারপর ছুটে এসে মাকে কায়দা শিখিয়ে দেয়। বাহাদুরীর ঢঙে বলে, নাহ্, তুমি কিচ্ছু জানো না মাম্। পাপা কত জানে বল তো?

এখন ওর সেই আধভাঙা বুলি আর নেই। কথা কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে। অনুভূতিশক্তিও প্রবল। তোতাপাখির মতন অনর্গল বকে যায়। দিনরাত শুধু পাপা, পাপা, পাপা। ঝিলিমিলি বোঝে ওর ছোট্ট বুকটা দুলে ওঠে পাপার কথা বললে। বন্ধ বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, পাপা, আর জল ঢেলো না। অছুপ হবে। পাপা আমার ছন্নে খেলবে না? আচ্ছা, পাপা

বল তো, ক্যাত্ (ক্যাট) মানে তো বেড়াল, তাহলে চকলেতের নাম ক্যাতবেরী হল কেন।

ঝিলিমিলি হেসে ফেলে। বলে, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো, টুম্পা?

কেন পাপার ছন্নে?

পাপা আবার কোথায়? তুমি কি পাগল?

আমি এমনি দুষ্টুমী কচ্ছি। পাপার ছন্নে কথা বলতে ইচ্ছে কচ্ছে তো তাই।

উদাস হয়ে যায় টুম্পার গোল গোল চোখ দুটো কিছু সময়ের জন্যে। দুষ্টুমীভরা হাসি কোথায় মিলিয়ে যায়। তখন ঝিলিমিলিও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ওর মন কেমন করে।

মা আর ছেলে দুজনে মিলে তখন যেন বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের বাসিন্দা। ওরা শুধু দীপনের কথা বলে। ঝিলিমিলি বলে, পাপার জন্যে তোমার কষ্ট হয়?

হুঁ। তোমার হয় না মা?

হয়। নিঝুমপুর ভাল না কলকাতাটাই ভাল রে?

নিঝুমপুর। ওখানে যে পাপা ছিল।

আমি রেলগাড়ি চালাবো মাম্, কু ঝিক্ ঝিক্ গাড়ি করে পাপার কাছে পালিয়ে যাবো। তোমায়ও নেব।

মা আর ছেলের এই একটা ব্যাপারে আশ্চর্য মিল, যখন এই দুই অসম বয়েসী মানুষের সমস্ত চিন্তা একই বৃত্তে ঘুরপাক খায়। তারা তখন সময় হারিয়ে ফেলে। দীপন রায় নামের জনৈক ভদ্রলোককে কেন্দ্র করে এক তরুণী এবং তার ছোট্ট শিশু কোথায় যেন হারিয়ে যায়। ঝিলিমিলি ভাবে, অথচ নিঝুমপুরে ওরা যখন এক সঙ্গে ছিল, কই তখন তো দীপন এমন দুর্লভ হয়নি। মাঝে মাঝে অসহ্য লাগতো যখন দুজনের মতে দারুণ অমিল হতো। একজন উত্তরমেরু এবং অন্যজন দক্ষিণ-মেরুর বাসিন্দার মতন কত

রাত কাটিয়ে দিত উত্তর আর দক্ষিণের ঘরে। কত রাত পর্যন্ত ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে একা একাই চাঁদ দেখতো ঝিলিমিলি। বর্ষার আকাশ দেখতো। বৃষ্টির তেরছা ছাঁটে যখন ভিজতে থাকতো ঝিলিমিলি, দীপন তখন ডুবে থাকতো বইয়ের পাতায়। শুধু কি তাই? পরাধীনতার যন্ত্রণাও কি ছিল না?

আমার পছন্দ নয়, ওটা।

আমার পছন্দ নয়, এটা।

তুমি মিসেস রায় একথা কখনই ভুলবে না।

তুমি এর সঙ্গে মিশবে না। তুমি ওর সঙ্গে মিশবে।

এমনি কত খুঁটিনাটি ব্যাপার। কতদিন কত কথা-কাটাকাটি হতো দুজনের। স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ ছিল দীপনের। সেই বিদ্রোহের নায়ক দীপন রায় বলতো, মেয়েদের ফ্রীডমের কথা যারা ভাবে, তারা একেকটি আস্ত পাগল। ঝিলিমিলি বলতো, তোমার সঙ্গে থেকে থেকে আমি যেন কেমন মধ্যযুগের হয়ে যাচ্ছি। মধ্যযুগের মেয়েদের মত প্রত্যেক পদক্ষেপে স্বামীর অনুমতি ভিক্ষা। কিন্তু মশাই, এই যুগটা কি সেটা একবার ভেবে দেখেছেন?

যুগের কথা আমি শুনতে চাইনি। আমি চাই আমার বউয়ের কথা।

ভুরু কুঁচকে ঝিলিমিলি বলতো, তাই! তবে একটা অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়েকে বিয়ে করলেই তো পারতে। যে তোমার কথায় উঠতো আর বসতো। লক্ষ্মীর পাঁচালি আওড়াতো,—

স্বামী সার, স্বামী ধ্যান যার আছে জ্ঞান,
মরিলে আমার কোলে সেই স্থান পায়,
বিপরীত করে যেবা নরকেতে যায়।

খিল-খিল করে হেসে উঠতো ঝিলিমিলি নিজের রসিকতায়। তখন দীপন ইজিচেয়ারে শুয়ে পা নাচাতো। মুচকি হেসে বলতো, সেই লক্ষ্মীর পাঁচালীর আদর্শই আমি চাই আমার বাড়িতে বর্তাবে।

বাহ্, চমৎকার। ঝিলিমিলির এই ব্যঙ্গ কিন্তু মোটেই স্পর্শ করতো না দীপনকে। ও ওকে বুকের মধ্যে বন্দী করে ফেলতো। চুম্বনের হাজারটা রেখা এঁকে বলতো, আমি চাই, আমিই একমাত্র তোমার ধ্যান-জ্ঞান হবো, তোমার নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র্য থাকবে না।

সেই একই মানুষ দীপন রায় কলকাতা এসেই বদলে গেল। স্ত্রীর নামে নেমপ্লেট লাগালো দরজায়। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগে ঝিলিমিলির। স্ত্রীকে একা রেখে যাবার সাহস তার হলো? দীপনের অনুপস্থিতিতে সে যদি বদলে যায়? যদি তার নিজস্ব বোধের পৃথিবীটা মাথা তুলে দাঁড়ায়? তার ধাক্কা কি সহ্য করতে পারবে দীপন? এই প্রশ্নটা সে দীপনকেও করেছিল, দীপন বলেছিল, একবার পরীক্ষা হয়েই যাক না বউকে কতটা স্বাধীনতা দিতে পারি আমি!

ঝিলিমিলি কটাক্ষ করে বললো, তুমি কি আমার সঙ্গে হেরে যাচ্ছো নাকি?

কি রকম?—জোড়া ভুরু কপালে তুলে তাকালো দীপন।

ঝিলিমিলি বললো, এতদিন বাদে আমার স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতার কথা ভাবতে শুরু করেছ?

দীপন বললো, বললুম তো পরীক্ষা করছি, যে স্বাধীনতার প্রতি তোমার এতো মোহ, সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার তুমি কতদূর করতে পারো।

ভালই তো, এবারে ঝাণ্ডা হাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বো, নইলে মিনি বাস চালাবো।—ঝিলিমিলি গলায় শ্লেষ ঢেলে বললো।

দীপন সিগ্রেটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, ঝাণ্ডা হাতে বেরিয়ে পড়া, অথবা একটা মিনি বাস চালানোর মধ্যে কোন বাহাদুরী নেই। তুমি আমায় প্রমাণ দাও যে, সর্বক্ষেত্রে তোমরা মেয়েরা পুরুষের সমান।

ঝিলিমিলির ঠোঁটে হাসির রেখা পড়লো। ও বললো, যথা?

দীপন কায়দা করে ধোঁয়ার রিঙ ছুঁড়লো। বললো, যেমন,

আমার কেয়ার অফ নয়। তুমি কিছুদিন তোমার কেয়ার অফ-এ বেঁচে থাকো। আমি দেখতে চাই দীপন রায় ছাড়াই ঝিলিমিলি রায় চলতে পারে কি না।

হ্যাঁ, পারবে না কেন? দীপনের ফেলে রেখে যাওয়া ইজিচেয়ারটায় বসে পা দোলাতে দোলাতে ঝিলিমিলি ভাবছে, ও এসে ঠিক অবাক হয়ে যাবে। এই ক' মাসেই সে কেমন বদলে গেছে।

পাড়ার ছেলেরা আসে চাঁদা নিতে। রসিদ কেটে দিয়ে যায় ঝিলিমিলি রায়ের নামে। দীপন রায় এখানে অনুপস্থিত এবং যেহেতু ঝিলিমিলি রায়ের নাম ঝুলছে নেমপ্লেটে। আগে খুব অস্বস্তি হতো ঝিলিমিলির। এখন আর হয় না। নিঝুমপুরে স্বামীর কেয়ার অফ-এ থাকতেই ও অভ্যস্ত ছিল। সেখানে চাঁদার রসিদে থাকতো দীপন রায়ের নাম। কোলাপসিবল গেটে লাগানো নেমপ্লেটটা তারই নামে। সেই নেমপ্লেটের এক কোণেও জায়গা পায়নি ঝিলিমিলি। ওর তো আলাদা কোন অস্তিত্ব ছিল না। ওর পরিচয় ছিল, মিস্টার অমুকের মিসেস হিসেবে।

উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার। তার মিসেস হিসেবে পরিচয়টাই যথেষ্ট। কিন্তু এর নাম কলকাতা। এখানে কে কি করে না করে কে তার হিসেব রাখে। দীপন রায়ের মতন হাজার হাজার দীপন রায় রয়েছে। তাই হয়ত নেমপ্লেটে নিজের নামটা রাখা বাহুল্য বলে মনে করেছিল দীপন।

ঝিলিমিলি ভাবছে, যে স্বাধীনতার ওপরে ওর এতখানি লোভ ছিল, সেই স্বাধীনতা হাতের মুঠোয় পেয়েও ও ভোগ করতে পারছে না কেন? আজ পর্যন্ত একদিনও ও একা গিয়ে বসতে পারলো না কোন সিনেমা হাউসে। রিসার্চ করবো, আমি ডক্টরেট হবো, তুমি আমায় সুযোগ দিচ্ছো না কেন?—বলে যে মাথা খুঁড়ে মরতো, কই আজ সে তো একদিনও ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পৌঁছুতে পারলো না? ন্যাশনাল লাইব্রেরীটা চোখে পড়ে, যখন

ছেলেকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যায়। রানীর বাড়ি যাবো মাম্‌, রানীর বাড়ি যাবো, বলে যেদিন টুম্পা কান্না জুড়ে দেয়, সেদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যাবার পথে তার ব্রিটিশ কাউনসিলের কথা মনে পড়ে। রিসার্চের জন্যে নামটা রেজেস্ট্রি করতে হবে। ঝিলিমিলি স্বপ্ন দেখে, সেই বিয়ের আগের স্বপ্নটা। ও একজন ডক্টরেট। কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কোন এক নামী দামী কলেজে সে পড়াচ্ছে।

এখন মনে হয়, দূর ছাই, কে চেয়েছিল এই স্বাধীনতা? দীপন কি সব ব্যাপারেই অবিবেচক ছিল? মোটেই না। অনেক ব্যাপারে তো ওর উদারতাও ছিল। নিঝুমপুরে রিসার্চ-টিসার্চের কোন সুযোগ ছিল না বলেই তো ও পারেনি।

ঝিলিমিলির মনে বিক্ষোভের শেষ নেই। ও ভাবছে, এই বিরাট কলকাতার জনারণ্যে ও কেন পারছে না নিজেকে হারিয়ে ফেলতে? একক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু ফেলে-আসা দ্বৈত জীবন ওকে বার বার পিছু টানছে। ওর কেন যেন রাগ হচ্ছে দীপনের ওপরে। প্রবল অভিমানও। ওর চিঠি লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে, আর কতদিন পড়ে থাকবে বিহারের জঙ্গলে?

একদিন দীপন এসে দাঁড়াবে। বলবে, কেমন আছো?

ও কি বলবে, একদম ভাল না?

কেন এমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব?

এ আমি চাইনি।

নিশ্চয় চেয়েছিলে। নিঝুমপুরে পরাধীন জীবন। প্রতি পদে পদে তো আর-একজনের খবরদারীতে অস্থির হয়ে যেতে।

ঝিলিমিলি যেন অপলকে তাকালো। যে চোখে লেখা, তোমার কাছে পরাধীনতাই আমার সুখ। দীপন কি পড়তে পারবে সেই ভাষা? সেই চোখের ভাষা, স্বতন্ত্র অস্তিত্বে আমার লোভ নেই। আমি তোমার কেয়ার অফ-এই বাঁচতে চাই। কিন্তু একথা কি বলতে পারবে ঝিলিমিলি? এ যে ওর আশ্চর্য পরাজয়।

আজকাল

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বললেন, এক্সট্রিমলি সরি, আমার আসতে ঘণ্টাখানেক লেট হলো। পাঁচটায় বলে আমি ছটায় এলাম। হঠাৎ আমার একটা জরুরী কাজ পড়ে গেল। আপনারা নিশ্চয় অনেক--ক্ষণ অপেক্ষা করছেন?

রমেন মাথা নেড়ে হাসল। অর্থাৎ কথাটা ঠিক।

রেজিস্ট্রার তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বসুন, বসুন। বলতে বলতে চেয়ারটা টেনে নিলেন। আমরা বসলাম ওঁর উলটো দিকের চেয়ারে। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবল। আমি আর রমেন পাশাপাশি বসলাম। রমেনের পাশে অশোক, লীনা, আর আমার পাশে শিবাজী, পারমিতা।

রেজিস্ট্রার বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন। বেয়ারা আলমারী থেকে ফাইল বের করল। অনেকগুলো ফাইল। পারমিতা, শিবাজীরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে অল্প হাসল। তারপর ফিস-ফিস করে কি যেন বলল। রেজিস্ট্রার ফাইল ঘাঁটছিলেন তখন। আমি কিচ্ছু শুনতে পেলাম না। আমার চোখের ওপর তখন ভাসছিল মহিলা রেজিস্ট্রারের শূন্য সিঁথিটা। ধবধবে সাদা। ওঁর শাড়ির জমির রঙ সাদা। রীমলেস চশমার মধ্যে দিয়ে বড় বড় চোখ। বয়েস বোঝা যায় না। তিরিশ কি পঁয়তিরিশ।

পারমিতা আমার কানের কাছে মুখ এনে খুব আস্তে বলল, কী বেরসিক মহিলা রে, অন্যকে বিয়ে দিতে দিতেই মাথার চুল পাকালেন, নিজের বিয়ের আর সময়ই পেলেন না। শিবাজী ঠোঁটে আঙুল রেখে জিভ দিয়ে আওয়াজ তুলল, হিস্।

পারমিতার তবু গ্রাহ্যই নেই। আবার বলল, হয়ত অনেক লভার আছে, ঠিক করতে পারছেন না কার গলায় ঝুলবেন মহিলা।

উফ! শুধু কথা কথা কথা।—ওর পিঠে খোঁচা মারল শিবাজী। বলল, তা তোমার মতন ফুল অব লাইফ তো সবাই নয়, এত লাকিই বা কজন হয়, বল?

ভুরু কুঁচকে তাকাল পারমিতা।

আমি কোন কথাই বলছিলাম না। আমার কাছে যে পরিষ্কার ছিল ওঁর সিঁথির অর্থটা। ইচ্ছে করছিল না ব্যাখ্যা করতে এখন, এই মুহূর্তে।

চুনবালির গন্ধ। মেঝেতে গোলা চুনের ছিটে। চেম্বারের চেয়ারগুলো এদিক ওদিক ছড়ানো। এখন ভাল করে গুছিয়ে উঠতে পারেনি বেয়ারা। আজ সকালেই হয়তো হোয়াইট ওয়াশ করানো হয়েছে। আমরাই হয়তো প্রথম ক্যানডিডেট।

অশোক মুখ খুলল এতক্ষণ পর। রমেনের পিঠে একটা হাত রেখে বলল, আর জায়গা পেলি না হতভাগা। শেয়ালদার এই ঘিঞ্জি গলি, তারপর আবার সময়ের ঠিক নেই, পাঁচটায় বলে ছটায়।

কোন উত্তর দিল না রমেন। মুচকি একটু হাসল শুধু। ও আজ আমার মতনই চুপচাপ। জানি না কেন। হয়তো মন ঠিক নেই। নইলে নিশ্চয় বলতো, তোমরা ভাল জায়গায় যেও।

এতজনের এত মন্তব্য রেজিস্ট্রার যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন না। ফাইল সরিয়ে নতুন ফাইলে হাত দিচ্ছেন। কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না উনি, সেই বিশেষ নম্বরের ফর্মটা।

ওঁর মাথার পেছনে দেওয়ালের পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে এনলার্জ করা বাঁধানো একটা ফটো। তার নিচে লেখা মৃত্যু, ১৯৬৮। জন্মটা আর লেখা নেই। আমি এই প্রথম এমন একটা ফটো দেখলাম যার নিচে জন্ম লেখা নেই, কিন্তু মৃত্যু আছে। এই ঘরেই

রোজ কত বিয়ে হয়, মনে হলো। এখানে যারা নতুন জীবনের শপথ নিতে আসে, তাদের চোখের সামনে প্রথমেই ভাসে জীবনের শুরু নয়, শেষ। খেয়ালটা কার, আর্টিস্টের না রেজিস্ট্রারের জানি না। যারই হোক, জন্মের মতনই তিনি মৃত্যুটাকেও সুন্দর দেখেছেন হয়তো।

এই ফটোর ভদ্রলোক আমার চেনা। আর বছর আমি ওঁকে দেখেছিলাম। সেদিন তিনিও ছিলেন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার। স্বামী, স্ত্রী পাশাপাশি বসতেন দুটি চেম্বারে। আমি এসেছিলাম আমার এক বন্ধুর বিয়ের সই দিতে। মহিলার সিঁথিতে ছিল চওড়া সিঁদুর সেদিন। আচ্ছা, রমেনের অবর্তমানে আমি কেমন? সাদা দেওয়ালের গায়ে চোখ আমার। পেরেকের সঙ্গে ফটোটা ঝুলছে বাতাসে। মাথাটা গেল যেন। আর ভাবতে পারছি না। আরে দূর দূর, ওসব সংস্কার। একটা সাদা সিঁথির কথা মনে পড়ে গেল। আকাশে ওড়া একটা পাখি। কিন্তু বড় একা। আমি বোধ হয় আরেকটু সরে বসলাম রমেনের দিকে। আড়চোখে দেখলাম ওকে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ভুরু বাঁকা। ও কিছু ভাবছে? পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা সিগারেট খুঁজছে হয়তো। চারমিনার। ওর হাতে চারমিনারের প্যাকেট দেখলাম। সেই বিশ্রী গন্ধ। এর চেয়ে বিড়ি খেও—আমি কতদিন বকেছি ওকে। এখন মনে হলো, আমার বুকের যন্ত্রণাটা হয়তো সেরে যেত চারমিনার পেলে। রমেন উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অশোকও। ওরা বাইরে গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। আর শিবাজী চেয়ে রইল। পারমিতা চেপে ধরেছে ওর শার্টের পকেট। আমি দেখলাম। হাসলাম।

অশোক ছুঁড়ে দিল আমায় ড্যান্স অফ্ ডেথ। ওর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। কেমন বুঝছ?—অশোক বলল। লীনা বলল, অসভ্য, এ সময় এ বই কেন?

মুচকি হাসল বোধ হয় রমেনও। চেয়ার ধরে দাঁড়িয়েছিল

আমার পেছনে। ও আমার হাত ছুঁয়ে বইয়ের মলাটটা পড়ে নিল।

আজকের ক্যানডিডেট কারা? রেজিস্ট্রারের চোখে জিজ্ঞাসা।

ছেলে আর মেয়ে পাশাপাশি বসেছেন তো? উনি জানতে চাইলেন আবার।

হ্যাঁ, আমরা পাশাপাশি বসেছি। শিবাজী বলল। খুব আস্তে কথাটা ছুঁড়লেও শুনতে পেলেন রেজিস্ট্রার। বললেন, কিন্তু ক্যানডিডেট কারা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। উনি হাসবার চেষ্টা করলেন। অশোক বলল, কেন আমরা? আপনি বুঝি বুঝে উঠতে পারছেন না?

কি করে বুঝব বলুন? আপনারা সবাই তো বসেছেন জোড়ায় জোড়ায়।

শব্দ করে হেসে উঠল সবাই। আমার চোখ দেওয়ালের গায়ে। ফটোটাই দেখছিলাম শুধু। রেজিস্ট্রার নিঃসন্দেহে রসিক। পেপার-ওয়েটটা নাড়া-চাড়া করতে করতে আবারও বললেন, আজ তো বোধ হয় উইটনেস আপনারা? তা ক্যানডিডেট হয়ে আসছেন কবে? ওঁর প্রশ্নটা অশোকের দিকে। অশোক বলল, ছ মাস পর। অবশ্য আপনার চেম্বারে নয়। ছাদনাতলায় পুরুতের চেম্বারে।

সবার মতন জোরে হাসতে হাসতে শিবাজী হঠাৎ থেমে গেল। বলল, যত সব বোকা ব্যাপার তোদের অশোক। ব্যাকডেটেড কোথাকার। বিশ্বাস করিস ওসব মন্তর পুরুত? টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করাব কথা আমি তো ভাবতেই পারি না।

অহো!—টিপ্পনি কাটল পারমিতা।

খেয়াল করল না ওরা কেউ। আমি বুঝলাম, ওর ব্যঙ্গ শিবাজীর মতন ছেলের মুখে ও কথা বড় বেমানান। এ ধরনের ছেলেরা যেন কেমন। স্বার্থপর সুবিধেবাদী। পিসতুতো বোনের সঙ্গে প্রেম করতে পারে, আর বিয়ে করার বেলায় সমাজের ভয়। এদিক

থেকে বলা যায়, রমেনের সাহস আছে। ও তো আমায় অস্বীকার করতে পারত। কিন্তু করেনি। একটা সই দেবার মতন সাহস ওর আছে। সাহস? সাহসই বা বলি কি করে? পরমুহূর্তেই আমি ভুরু কুঁচকে তাকালাম রমেনের দিকে। আত্মশক্তিতে আস্থাবান ওর বড় বড় চোখ দুটোকে আমার ব্যঙ্গ করতে ইচ্ছে করল। মনে হলো, ও একটা ভীতু, কাপুরুষ। সাহসই যদি ওর থাকবে, তবে তো আজ বাবা মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারত। আমার পরিচয় দিত। কিন্তু তা ও দেবে না। তাই এই সব হয়ে গেলে আমরা প্রথমে উঠব একটা হোটেলে। তারপর ওর বাড়ি থেকে অনেক দূরে সাউথের দিকে একটা ফ্ল্যাটে।

ঘন হয়ে বসল রমেন। আমায় বলল, এই, তোমার বাবাকে একটা ফোন করে দিও।

কেন?

নইলে সে ভদ্দরলোক আবার পুলিসে না ডায়েরী করে বসেন।

করবেন, সেটা তাঁর কর্তব্য।

যাঃ, একটা কেলেঙ্কারী ব্যাপার···

তবু আমি পারব না।

রমেন বলল, গলার সুর পালটে যাচ্ছে দেখছি। এসব ফল্‌স সেন্টিমেন্টের কোন মানে হয়?

শিবাজী তাকাল আমার দিকে। মুখ টিপে একটু হেসে বলল, এরই মধ্যে দাম্পত্য কলহ?

আমি কিছু সময় যেন ভুলে ছিলাম আমার মা আর বাবাকে। এখন নতুন করে অনুভব করলাম আবার পুরনো যন্ত্রণাটা। হয়তো কোনদিনই সারবে না ওটা। আমি তো জানি আমার বাবাকে। এ অন্যায়ের ক্ষমা নেই তাঁর কাছে।

সাড়ে ছটার ঘণ্টা পড়ল। রুমকিটা হয়তো দিদি দিদি করছে। আসবার সময় কোত্থেকে যেন ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরল।

বলল, আমার ক্যাড্‌বেরি? কথা দিয়েছিলাম, এনে দেব।—তারপর ওকে কোলে তুলে আদর করতে গিয়ে চোখে আমার জল এসেছিল। ও তো জানে না, আর কোনদিন ফিরব না আমি! না, আমি আর কোনদিনই ফিরব না, দেবীনিবাস রোডে, আমার পাড়ার চেনা গলিটাতে। আজ আমি সারাজীবনের মতন বেরিয়ে এলাম, বেরিয়ে এলাম নয়, পালিয়ে এলাম।

বাবা কি এখনও ফেরেননি আপিস থেকে?···নিশ্চয় ঘর-বার করছেন। হয়তো মাকে বলছেন, ওগো, তোমার নন্দিনী ফিরবেন কখন? জানি না।—মায়ের ঝংকার। বলবেন, তোমার মেয়ের খবর তুমিই জানো। এখন তো লাইব্রেরী নেই, ইউনিভার্সিটি নেই, তবে বোধহয় আড্ডায়। আড্ডাটি কোথায়? কফি হাউস?

জানি না।

নাঃ। মেয়েটাকে দেখছি তাড়াতাড়িই পার করতে হবে।

কেন, আবার ল' পড়াবে না? উকিল করবে না? খুব তো বলেছিলে, তোমার আস্‌কারা পেয়ে পেয়েই তো ও গোল্লায় গেল।

মায়ের কথার উত্তরে আমার ছেলেমানুষ বাবা হয়তো চেঁচাবেন। বলবেন, দোষ আমার একার? কেন বাধা দাওনি, পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে যখন আড্ডা-ফাড্ডা দিত, রাজনীতি করত?···

ফ্যানের স্পীডটাকে যদি কেউ বাড়িয়ে দিত! প্রবল অসোয়াস্তিতে আমি ঘামতে লাগলাম।···

লাভ-ম্যারেজ সুখের হয় না, নন্দি।—সেদিন মা বক্‌বক্‌ করতে করতে বলছিল।

কে বললে হয় না?

আমি বলছি হয় না। তোদের বয়েস কম, রঙীন কাঁচের মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে দেখছিস, এখন নয়, তোরা পরে বুঝবি আমার কথা।···মা বলছিল, শুঁড়িখানায় মাতাল যখন ঢোকে, তখন দুনিয়া ভুলে যায়, পরদিন নেশা কাটলে মনে পড়ে সংসার, সমাজ।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের দশাও হয়েছে তাই। প্রেমে পড়লে মনে করে, আর কিছুর দরকার নেই। শুধু আমি-তুমি থাকলেই হল। পরে সেই অদরকারী জিনিসগুলোই তো দরকারে লাগে, তখন অনুশোচনা করে মরিস কেন ?···

আমরা কোনদিন অনুশোচনা করব না মা। আমি যেন চেঁচিয়ে বলতে চাইলাম মাকে। মুহূর্তে চোখাচোখি হলো আমার রমেনের সঙ্গে। আমি প্রেম খুঁজলাম। ওর চোখের মধ্যে আশ্রয়, পৌরুষ।

দিদির বিয়ের দিন শাঁখ বাজছিল। উলু পড়েছিল ঘন ঘন অন্ধকার ভোরে। নতুন লাল শাড়ি পরে আইবুড়ো ভাত খেয়েছিল দিদি।···ঠাকুরমা বলছিলেন, ওর এঁটো ভাত খেলে নাকি তাড়াতাড়ি বিয়ে হবে। সেই থেকে রোজ বায়না ধরতাম, আমায় কবে বিয়ে দেবে মা ? দিদির মতন গা-ভরা গয়না ?···এই !—রমেন ডাকল। তোমার মাকে আমি অন্তত একটা ফোন করি।

না।

কেন ?

শকড হবেন।

ভুল। উনি বরং খুশীই হবেন তাঁর মেয়ে পাকা শিকারী ভেবে।

শিকারী ?

নয় ! বিনে পয়সায় এমন রাজপুত্তুর !

হাসল অশোক আর লীনা। আমি গম্ভীর। আশ্চর্য ! রসিকতার তো একটা সময় আছে। আমার মুখের ভাব লক্ষ করেই হয়তো প্রসঙ্গ পাল্টালো লীনা। বলল, পারমিতা আর শিবাজী হঠাৎ ঝিমিয়ে গেল কেন রে ?

যাবে না ?—অশোক বলল, অনন্তকাল ধরে যদি শুধু বিরহই···

কথাটা শেষ করতে দিল না শিবাজী। বলল, বিরহ এক ধরনের মানসিক বিলাস। এর জন্যে হৃদয় চাই, বুঝলি ? দে দে, একটা সিগারেট দে, বাইরে গিয়ে একটু ধরাই।

রেজিস্ট্রার কাগজটা বাড়িয়ে ধরলেন রমেনের দিকে। বললেন, এইখানে সই করুন।

প্রথমে রমেন, তারপর আমি সই করলাম কাগজে। থর থর করে কাঁপল আমার হাত। নিজের সইটাই যেন কেমন পাল্‌টে গেল। আর মনটা? অচেনা স্বামীর কাছে যাবার সময় মেয়েদের মন নাকি এমনিই হয়। কিন্তু আমার হচ্ছে কেন! ও তো আমার অচেনা নয়। ও তো আমার অনেক দিনের জানা-চেনা। কলেজ আর ইউনিভার্সিটি মিলিয়ে চার বছর মেলামেশা করলাম ওর সঙ্গে। ক্লাস কেটে আড্ডা মারতাম ইউনিয়ন রুমে, ওর মেসের ঘরে, আর কেউ যখন থাকত না দুপুর বেলায়।

রেজিস্ট্রার তাকালেন। চশমার মধ্যে দিয়ে ওঁর চোখ দুটোকে দূরের মনে হলো। কাছে থেকেও যেন নেই। বড় শান্ত গলায় বললেন, এঁর হাতে হাত রাখুন। আমি হাত রাখলাম রমেনের হাতের মধ্যে। জলতরঙ্গের মতন বাজতে লাগল রেজিস্ট্রারের শপথ—

আজ হইতে আমি শ্রীযুক্ত আদিনাথ সেনের কন্যা কুমারী নন্দিনী সেনকে বৈধ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলাম।

রমেন ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, আজ হইতে আমি শ্রীযুক্ত আদিনাথ সেনের কন্যা···ওর কথা শেষ হলো না। রাস্তা দিয়ে একটা মিছিল যাচ্ছিল, তার স্লোগান রমেনকে বোধ হয় বিচলিত করল, ও পেছনে একটু ঘুরে তাকাল। রেজিস্ট্রার বললেন, বাধা পড়ল। আপনি আবার বলুন। রমেন অন্যমনস্কভাবে নতুন করে বলতে লাগল, আজ হইতে আমি শ্রীযুক্ত আদিনাথ সেনের কন্যা কুমারী নন্দিনী সেনকে বৈধ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলাম।

রেজিস্ট্রার তারপর তাকালেন আমার দিকে। বলুন, আজ হইতে আমি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান রমেন চট্টোপাধ্যায়কে ধর্ম-স্বামীরূপে স্বীকার করিলাম।

আমিও উচ্চারণ করলাম ধীরে ধীরে। আমার গলাটা প্রায়

ধরে এল। কথাগুলো কেঁপে কেঁপে গেল। আমার মনে পড়ল একটা মুখ। সে মুখ আমার মায়ের। লাল পাড় গরদ, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। দিদির বিয়ের সময় আড়ালে আড়ালে কাঁদছিল মা। ...আমার মনে পড়ল আরেকজনকেও। সে আমার বাবা। সারাদিন উপোস থেকে পুরুতের সামনে সম্প্রদান করার সময় বাবার চোখে জল দেখেছিলাম।...হোম, যজ্ঞ, শঙ্খ, সানাইয়ের কান্না, গুরুজনের আশীর্বাদের ভিড় ঠেলে ঠেলে দিদি চলে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি।... আমিও তো যাব মা। দিদির মতন বেনারসী পরব, আল্‌তা, সিঁদুর, গয়না। দিদির মতন তারপর কাঁদতে বসব যাবার আগে।

ন্ না। আমি তো একালের মেয়ে। আমরা নিজেরা যেচে যাই স্বামীর ঘরে।

এবারে রেজিস্ট্রার বললেন, আপনারা আপনাদের বাবা, মা, সমস্ত গুরুজনদের মনে মনে প্রণাম জানান। আমিও আপনাদের জন্যে করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আপনারা সুখী হোন, আপনাদের মঙ্গল হোক।

আমি চোখ বুজলাম। ঈশ্বর আমি মানি না। কাকে যে প্রার্থনা জানাব ভেবে পেলাম না। অস্পষ্ট কতগুলো ছায়ামূর্তি আমার অন্ধকার চোখের মধ্যে ভেসে বেড়াল। তারা মৃত এবং জীবিত আমার অগুনতি গুরুজন। অয়েল পেন্টিংয়ের আমার ঠাকুরদা, ঠাকুরমা,...আমার দাদামশায়, দিদিমা...আমার মা এবং বাবা। মনে হলো, ঈশ্বর আমি মানি না, কিন্তু এদের তো অস্বীকার করতে পারি না। অবশ্য এদের আশীর্বাদ, অভিশাপে আমার কিছুই আসে যায় না। তবুও যেন আজ এদের কাছে আমি কিছু চাইলাম। আমি যে কাদের মঙ্গল চাইলাম জানি না। আমার, রমেনের, পারমিতার, শিবাজীর, অশোক এবং লীনার, কোন স্পষ্ট মুখ আমার মনে পড়ল না। হয়তো বলতে চেয়েছিলাম, তোমরা তাদের মঙ্গল কর যারা অমতে বিয়ে করে, আশীর্বাদ পায় না তোমাদের।

রমেন প্রণাম-ট্রনাম কিছুই করল না। আমি জানতাম, ওর কোন সংস্কার নেই, বিশ্বাস নেই, ভক্তি নেই।···তবু কেন যেন মনে পড়ে গেল সুব্রতদার মুখ। গাঁটছড়া বেঁধে যাবার সময় দিদিরা ঠাকুরঘরে প্রণাম করেছিল। সুব্রতদাও ছিল ঘোরতর নাস্তিক, তবু সেদিন প্রণাম করল।

রেজিস্ট্রার তাকালেন আর সব সাক্ষীর দিকে। ওদের বললেন, সই করুন।

একে একে সই করল ওরা। তারপর অশোক তাকাল লীনার দিকে। আর পারমিতা শিবাজীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। আমি দেখলাম, ওর চোখভরা ক্লান্তি।

রেজিস্ট্রারের আবার রসিকতা, শুভস্য শীঘ্রম্।

টি-ক্লাসে ভালই জমল আমাদের ছোটখাট পার্টিটা। আমাদের না বলে ওদের বলাই ভাল। একতরফা ঠাট্টা ইয়ার্কি। আমি রমেন নীরব শ্রোতা। উপস্থিত থেকেও না থাকার মতন। রমেন অন্যমনস্ক। আজ সারাদিন অনেকবারই যেমন তাকে দেখেছি। আমি ওদের কথা শুনছি, হাসছি। তবু মনে হচ্ছে, এই আনন্দের অংশীদার যেন আমি নই। বিয়েটাও আমার হয়নি। ও যেন অন্য কারো বিয়ের পার্টি। ভদ্রতা রাখবার দায়ে আমার আসা।

কথার তুবড়ি ছুটছিল। শিবাজীরা চুপ করে গেল হঠাৎ। ওর কাঁধে হাত রাখল অশোক, বলল, কি রে, কি হল?

ব্যাটা, ভাবছি।

কি ভাবছিস?

তোর বিয়ের অ্যাডভান্সটা আজ হলে মন্দ হতো না। গলায় পৈতে দেখিয়ে শিবাজী বলল, শালা, বৈদিক বামুন, বুঝলি! পুণ্যের এমন সুযোগ—

থাম্ থাম্। বামুন কি হয় পৈতে দিলেই গলায়? কে যেন

বলেছিলেন! তারপর বলল, শালা, তুই আবার বামুন হলি কবে?

শিবাজী অশোকের পকেট চেপে ধরতেই লীনা বলল, আহা-হা, এ অন্যায় জুলুম—

আমার দিকে চোখ ঘুরিয়ে লীনা বলল, আজ যাদের জন্যে এখানে আসা পকেটটা তাদেরই ধর না শিবাজী। আমাদেরটা তো রইলই।

অশোক বলল, পাটি খারাপ নয়, বুঝলি শিবাজী!

শিবাজী তাকালো, কি হে রমেন, এরা কি সব বলছে?

রমেন জবাব দেবার আগেই আমি বলে ফেললাম, তোমরা কিন্তু স্রেফ নিজেদের বাঁচিয়ে চলছ শিবাজী।

আমরা?—শিবাজী যেন আকাশ থেকে পড়ল। পারমিতার দিকে একবার তাকিয়েই পালটা আক্রমণ করল আমায়। আমায় নয়, রমেনকে।

তোদের আরেকটা ব্যাপারের অ্যাডভান্স না হয় এই সঙ্গেই হয়ে যাক। খরচা কম লাগবে।

আমাদের অ্যাডভান্স মানে!—বোকার মতন চেয়ে রইল রমেন। বুঝতে পারল না। আমার মুখ কাগজের মতন সাদা। কটা চোখের মণি ঘুরিয়ে হাসল শিবাজী। আর আট জোড়া চোখ পড়ল আমার আর রমেনের উপরে। বুঝলাম, ওরা জানে, আমাদের দুর্ঘটনার কথা। ওরা আমাদের বন্ধুলোক। তবু মানুষের দুর্বলতা নিয়ে এত বড় ঠাট্টা! মনে হল, আমাদের আধুনিকতার অহংকারকেও ছাড়িয়ে গেছে ওরা। পারমিতা ভুরু কুঁচকে শাসন করল শিবাজীকে। আশোকের ঠোটে রহস্যের হাসি। চোখ তুলে তাকাতে না পারলেও অনুভব করছি আমি। গরম লাগছে আমার। দু কান লাল, গরম। চোখের সামনে দপ্ করে জ্বলে উঠল, কাণ্ডজ্ঞানহীন রমেনের মুখ, আমার অনুরোধ। এতখানি অসহায় বোধ হয় আর কখনও মনে হয়নি নিজেকে! নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে রমেন বলল, কি হল? সব চুপচাপ?

আমি কখনও হারিনি। পরাজয় স্বীকার আমি করি না। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, শিবাজী, একদিনেই ছু' বোতলের দাম দিলে আবার ট্যাক্সির ভাড়াটাও যে দিতে হবে।

ওরা বিস্ময়ে বিমূঢ়। আমি চটে যাব ভাবিনি। হেসে পরিবেশ সহজ করল রমেন।

ওরা চলে গেল। অশোকরা দিয়ে গেল একরাশ রজনীগন্ধা। শিবাজীরা গোলাপ লাগিয়ে দিল আমার শাড়িতে, চুলে, রমেনের পকেটে। বলল, গুডলাক।

আমায় রমেন বলল, তুমিও একটু গুডউইশ জানিয়ে দাও।

জোর করে হেসে হাত নাড়লাম আমি। মুখটা যেন এখনও ফ্যাকাশে। রক্তশূন্য রুগীর মতন।

দরজা-ঢাকা পালকিতে চার-বেহারার কাঁধে চেপে মা এসেছিল শ্বশুরবাড়ি। আমার একালের সই করা বর আমায় নিয়ে তুলল ট্যাক্সিতে। আমরা বসলাম পেছনের সীটে। ছু'জনের মাঝখানে ফাঁকা একটু জমি। আজ যেন ওর ব্যবহারটা কেমন! পরের মতন। এই প্রথম ও বসল দূরত্ব রেখে, যা আর কোন দিন করেনি!

ট্যাক্সি ছুটল ভবানীপুরের দিকে। গোলমাল, চেঁচামেচি, ট্রাফিক পুলিসের লাল আলো। ভিখিরী হাত বাড়াল জানলায়। রমেন হিসেব লিখছে, কত টাকা খরচ হল আজ এবং আরো কত হবে! আকাশে এখন প্রচুর তারা। বাইরে মিষ্টি বাতাস। কোন কথা নেই ছু'জনের। সময় যাচ্ছে। তবু অফুরন্ত সময়। রমেনের গন্তব্যস্থলের আর কত দেরী? আজকের রাতটা নাকি সবচেয়ে মধুর, রোমান্টিক।—বলেছিল লীনা।

ওদের ব্যবহারটাই বা কেমন! কেন চলে গেল? বিয়ের রাতে তো বাসর জাগার রীতিই আছে। আমাদের জন্যে বাসর না থাক, হোটেল তো ছিল। নাচ, গান, হই, হল্লা। আমার ভাল না লাগলেও সয়ে যেত। আমাদের কথা ফুরিয়ে গেলেও

ওদের তো ছিল। শিবাজীর, পারমিতার, অশোকের, লীনার। আমরা হারিয়ে যেতাম ওদের কথার সমুদ্রে।

এখন আমি যেন আর আগের আমি নই। ক'দিন আগেও রমেনকে একা চাইতাম। পেয়ে পেয়েও তৃপ্তি হত না। আমরা সহ্য করতে পারতাম না আমাদের মাঝখানে তৃতীয় কাউকে। অথচ এখন অসহ্য লাগছে একা, এভাবে। কোথায় যেন একটা ছন্দপতন। আমি কেমন করে বোঝাব। ওর হাবভাব, চালচলন এতটুকু বদলায়নি। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম। সেই সিগারেট টানার কায়দা, চোখ বুজে কিছু একটা ভাবা ট্যাক্সির গায়ে মাথা রেখে। তবে কি পরিবর্তনটা আমার মধ্যেই? এই শোনো—আমি ওর পিঠে আগের মতন হাত রাখলাম।

বল।—রমেন বলল।

আমার ভাল লাগছে না।

তোমার ভাল লাগার জন্যে বল আমি কি করতে পারি?—ওর পাথরের মতন গলা।

জানি না।—ছিটকে সরে গেলাম আমি। রমেনকে আমার অচেনার মতন লাগল। মনে হল, যেন ও আমার প্রেমিক নয়, স্বামী নয়। ও আমার কেউ নয়। অপরিচিত এক লোকের সঙ্গে যেন আমি শেয়ারের ট্যাক্সিতে চলেছি।

আমি তাকালাম আকাশে। কালপুরুষের বাঁকা তলোয়ার। নক্ষত্রের আলো। আকাশটা অনেক বড়। মন কেমন করল যেন। কতদিন যেন লেকে যাইনি।

রমেন!—আমি মুখ নীচু করলাম।—আজকের রাতটা কি এভাবেই কাটাবে?

শুধু আজকের? বাকী জীবনের রাতগুলোও যে এমনি কাটবে না তা কি করে বলব!

না। কাটবে না। তুমি কী এত ভাব বল তো?—আমার

গলায় অভিমানের সুর।

ভাবছি মনুর কথা। নারী নরকের দ্বার কথাটা সত্যি।

আমি একটু হেসে বললাম, যদি বলি পুরুষ নরকের দ্বার?

আর কথা বাড়াল না রমেন। মাথা নীচু করে কপালের রগ টিপে ধরল।

তোমার মাথা ধরেছে?

না। ভাবছি, পার্টির কথা। সামনেই ইলেকসান। কত কাজ বাকী!

বেশ তো, কাল বেরিও, সঙ্গে আমায় নিও।

সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়, বল তো?

রমেন বলল, পার্টির কাজকম্মের ব্যাপারে লেডিজ নট করা দরকার।

রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলাম, লেডিজের অপরাধ?

একটি আইডিয়াল ছেলেকে পাঁকে টেনে নামাল।—রমেনের গলায় শ্লেষ।

কি? কি বললে? আমি তোমায় পাঁকে টানিনি, তুমি নিজেই নেমেছ।

নন্দিনী!

চেঁচিও না। এটা ট্যাক্সি।

ওফ! আমি হাঁপাতে লাগলুম ট্যাক্সির সীটে মাথা রেখে। কি ভুলই করেছি! মাগো, তখন কেন তোমার কথা শুনিনি। আমি চীৎকার করে বলতে চাইলাম, কেন আমি রমেনের কাছে যেতাম! আমার সেকেলে মা, তোমার কথাই সত্যি, পুরুষরা কখনও বন্ধু হয় না মেয়েদের। ওরা সুযোগ পেলেই লোভীর মতন হাত বাড়ায়।

মাথার মধ্যে তোলপাড় করছে আমার। বেশ তো ছিলাম। কেন যে সাধ করে বেড়ি পরলাম পায়ে।...ওর সঙ্গে আমার কোথায় যেন আলাপ? কোথায়? কফি হাউস না ইউনিভার্সিটিতে, মনে করতে পারছি না। ও রাজনীতি করত। পার্টির দলভারী করার

জন্যে ক্লাসে ক্লাসে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াত। গায়ে গেরুয়ারঙের পাঞ্জাবি। রুক্ষ চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

ট্যাক্সি এসে থামল জগুবাবুর বাজারে। রমেন নেমে গেল। আমি বসে রইলাম একা।…সেই ভবানীপুরে। কত যে ঘুরেছি এখানকার অলিগলিতে আমি আর রমেন রমেনের পার্টির উদ্দেশ্য প্রচারের জন্যে। তখন এ সব ব্যবসায়ীদের একেকটি স্বার্থপর সাংসারিক জীব বলে ভেবেছি। তখন কি জানতাম আসলে আমরাও একেকজন তাই! আদর্শ-টাদর্শ ওসব আমাদের মুখের বুলি, আমাদের গালভরা কথা।…আমি চেঁচিয়ে বলতে চাইলাম, রমেন, কেন আমায় টেনে নিয়ে যেতে ইউনিয়ন রুমে? কেন আমায় বলতে, কিছু কাজটাজ কর, জেলফেল খাটো, আবে বাবা, যে দেশের প্রধানমন্ত্রী মহিলা, সে দেশের…। রমেন, তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি ফাঁকা কথা বলে আমায় ভোলাতে চাইতে। আমি তো তোমার সঙ্গে প্রেম করতে চাইনি। বিয়ে চাইনি, সে কথা আজ আমি কেমন করে বোঝাব।

ফিরে এল রমেন। ওর হাতে দেখলাম, একটা জনতা স্টোভ। ও বলল, হাঁড়িটাড়ি আগেই কিনে রেখেছি।

তারপর ছোট ডায়েরীটা পকেট থেকে বার করল রমেন। ট্যাক্সিওলাকে বলল, হাওড়া।—আর আমায় বলল, তোমার বাবা পুলিসে খবর দিলেও কিছু করতে পারবেন না।

ও আরো বিড়বিড় করে কি সব বলছিল যেন। কিছু কানে এল আমার, কিছু কথা এল না। ও বলছিল, কয়েক বছরের বেহিসেবী জীবন, পরিশেষে রমেন চ্যাটার্জির নাটকীয়ভাবে মৃত্যু।

আমি ব্যঙ্গ করে বললাম, মৃত্যু নয়, পুনর্জন্ম।

রমেন দৃঢ়স্বরে বলল, যদি তাই, হয় তবে জেনে রেখো, বিগতজন্মের প্রতি আমার আকর্ষণ অনেক তীব্র ছিল, এই নবজন্মের চেয়ে।—নাটকের নায়কের মতন বলে গেল রমেন।

আমারও ছিল।—আমি বললাম, আমিও পুনর্জন্ম চাইনি রমেন।

মিথ্যে কথা।—রমেন বলল, তুমি এই চেয়েছিলে।

আর তুমি সাধু? তুমি চাওনি?

হ্যাঁ, চেয়েছিলাম, তুমি আমায় প্রভোক করেছিলে বলে।

আহ্, চুপ কর রমেন, আর ভাল লাগছে না, কত আর শোনাবে।

সারাজীবন ধরেই শুনতে হবে।—রমেন বলল। ওকে যেন আজ কথার নেশায় পেয়েছে।

ও বলল, তোমার জন্যে আজ আমার বাবা, মা, ভাইবোন সবাইকে ছাড়তে হ'ল। এই সই করলাম আজ সবার বিরুদ্ধে।

আমি আরও চেঁচিয়ে বললাম, কেন করলে?

ঘুরে তাকাল ট্যাক্সিওলা। রমেন বোধ হয় অপ্রস্তুত হ'ল। একটু চুপ করে থেকে খুব আস্তে বলল, আমি ভুল করে ফেলেছিলাম, তাই।

এখন বুঝি অনুশোচনা হচ্ছে? তা নার্সিংহোমে আমায় নিয়ে গেলেই তো পারতে।

আই হেট ইট। অ্যাবোরসানকে আমি ঘেন্না করি। ও উত্তেজিত হয়ে উঠল আবার।

তবে আর আফশোস কেন? সিভালরি দেখিয়ে চুপ করেই থাকো। আর কিছু বলল না, রমেন। আমার মনে হ'ল, সারাটা জীবন এত তিক্ততা, পরস্পরের প্রতি এত ঘৃণা নিয়ে আমরা ঘর করব! মিথ্যে হয়ে যাবে আমার অনেক বিকেল, সকাল, রাত। আমি চেঁচিয়ে বলতে চাইলাম, তুমি আমায় কোনদিনই ভালবাসনি রমেন। তুমি মুখোশপরা চিরকালের লোভী পুরুষ, বিয়ে তুমি আমায় বাধ্য হয়েই করেছ। না করে তোমার উপায় ছিল না। কেননা, সমাজকে বিবেককে তুমি ভয় পাও, তুমি ঈশ্বর মানো না, কিন্তু সমাজ মানো।

ঘৃণায় আমার শরীর শিউরে উঠল। মাথা ঘুরছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। অক্টোপাসের মতন কুৎসিত মনে হ'ল রমেনকে। আমি অনুভব করলাম, আমার শরীরের মধ্যে আরেকটা প্রাণীর

নিঃশ্বাস, স্পন্দন। বুক ফেটে কান্না পেল। আমার দেহের রূপ একটু একটু করে বদলাবে, পৃথিবীর স্বাদ ক্রমশ আমার কাছে বিস্বাদ তেতো হয়ে যাবে।

ট্যাক্সি থামল, ট্রাফিক পুলিসের হাতের নিশানায়। রক্তের মতন জ্বলছিল 'প্রিন্সেস'। মিনিস্কার্ট পরা একটি মেয়ের কোমর জড়িয়ে চোঙা প্যান্টপরা একটি যুবক ঢুকল সেখানে। চাপা উত্তেজনায় রমেন বলল, শালা, এবারে ক্যাবারেতে বসে নাচ দেখবে, আর মাল গিলবে, ওই করে করেই তো দেশটা উচ্ছন্নে গেল।

আমি চুপ। আমার দিকে একটু তাকিয়ে ও জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল সিগারেটের পোড়া টুকরোটা। ওর চোখে যেন আগুন মনে হ'ল। কিছু সময় চুপ করে থেকে রমেন আমায় বলল, কি, কাগজটা কি দেবে আমায়? নাকি সম্পত্তি করে রেখে দেবে?

আমি ছুঁড়ে দিলাম আমাদের বিয়ের দলিল।

একবার চোখ বুলিয়েই ও বলল, আরেকটা কাগজ নাওনি?

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। ও বলল, ডিভোর্সের?

আমি জ্বলে গেলাম। সরু করে তাকালাম ওর দিকে। তারপর বাঘের মতন থাবা মেরে কাগজটা কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললাম। ও হাসল। নাটকের একটা শয়তানের মতন মনে হ'ল ওকে। ও বলল, কিন্তু রেজিস্ট্রারের কাছে যে আরেকখানা কাগজ থেকে গেল!

কিছুদিন সেপারেসনে থাকতে হবে, তারপর তো ডিভোর্স।—আমি প্রায় মরিয়ার মতন বললাম। রমেন হাসল আবার সেই শয়তানের হাসি। বলল, ইতিমধ্যেই উকিলের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে দেখছি! তা আইনকানুনগুলো মুখস্থ রাখা ভাল।

কিছু বললে পারলাম না। শুধু মনে হ'ল, এই লোকটার প্রেমে পড়েছিলাম! হাসি পেল, সাজানো একটা ঘরের স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিছু সময় আগেও।···পালকিতে চার বেহারার কাঁধে চেপে শ্বশুরবাড়ি

যাচ্ছে আমার মা। আমি একালের মেয়ে, আমি যাচ্ছি ট্যাক্সিতে।

কেটে গেল অনেক মুহূর্ত। ঠিক কতক্ষণ হবে জানি না। জানি না, কেন অবাধ্য চোখ দুটো রমেনকে দেখল আরেকবার। এ দৃষ্টিতে প্রেম ছিল না। ঘৃণায় ওর দু চোখ বন্ধ। ও পড়ে আছে সীটের গায়ে।

গঙ্গার পাড় দিয়ে ছুটছিল ট্যাক্সি! বর্ষার আকাশে ছাইরঙা মেঘ, যুবক যুবতীরা সব জড়াজড়ি করে বসে আছে অন্ধকারে। বেশ আছে ওরা, আমরা ছিলাম যেমন একদিন। ওরা জানে না—কিছুই থাকবে না, এই উচ্ছ্বাস, ভাললাগা, মন দেওয়া নেওয়ার খেলা। এ সবই নাটক নাটক মনে হবে ওদের। সেদিন আমাদের মতন ওদেরও দর্শকের ভূমিকা। নোনাস্বাদের স্মৃতি রোমন্থন। কিছু বিষ। কিছু অমৃত।

বৃষ্টি নামল। ওরা ছুটছে। এমনি বৃষ্টিতে ভেজার নেশা ছিল আমাদেরও। জেটির পাশে গাছতলায় কতদিন ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়িয়েছি দুজনে।

এখন সেসব কাহিনী।

পিঠে যেন কার আলতো স্পর্শ পেলাম।

তুমি!

চিনতে পারছ না?

না।

ভীষণ লোভ হচ্ছে, নন্দিনী।

না, না, না—আমার গলায় কাঠিন্যের সুর।

চুপ, আস্তে।—লোকটা দেখছে আয়নায়।

কিছু উত্তাপ, কিছু যন্ত্রণা আমার বুকে। এ নাটক, না জীবন বুঝতে পারছি না। মনে হল, নাটক নয়—এই-ই জীবন।

কমলী

বাবুদের বাড়ির রোয়াকে পা ঝুলিয়ে বসল কমলী। কাছেই কোন এক পুজোর প্যাণ্ডেলে ষষ্ঠীর ঢাক বাজছে। কমলীর পরনে গাছকোমর বাঁধা পুরনো একটা ছাপার শাড়ি। কপালে আধমোছা সিঁদুর। ঘামে একেবারে লেপ্‌টে রয়েছে ওর গায়ের ব্লাউজটা। কমলী আঁচলটা দিয়ে ঘাম মোছে গায়ের, কপালের। ও এখন খুব পরিশ্রান্ত। সেই বিকেলে কাজে লেগেছিল, আর এই এখন ভর সন্ধ্যেবেলা তার ছুটি হল। জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে আকাশ। সেই আলোতেই কমলী খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয় তার পরনের কাপড়টা। সাদা জমির মধ্যে লাল বুটি। চমৎকার। জামা আর কাপড় এই তুটোই দিয়েছে এ বাড়ির দিদিমণি। এবার পুজোয় নতুন কিছু আর হবে না কমলীর। কাজটা খুব বেশী দিন আগে পায়নি কিনা। মা বলেছে, পুজোর মাত্র ক'টা দিন আগে এলি কমলী, আরো দিন কয়েক যাক তখন দেব। তা এরা লোক ভাল। এই বা ক'জন দেয়? দেওয়ালে পিঠ ঠেস দিয়ে একটু আয়েশ করে বসে কমলী। সুদামের চড়টা যেন এখনও লেগে আছে পিঠে। ইস! কী জোরেই না মেরেছে ও! সুদামের ওপরে প্রথমে ওর দারুন রাগ তারপর ঘেন্না হয়। মানুষটা রেগে গেলে যেন চণ্ডাল। কমলী অবাক হয়ে ভাবে, এই অগ্‌চটা মানুষডার সাথে বিমলীদিদি পাঁচ বছর কিভাবে ঘর কইরেছিল? ও তো সাপে কেটে মইরে গিয়ে বাঁইচলো। আপদটারে চেইপে দিয়ে গেল আমার ঘাড়ে। দিদি রে, তুই আর মরার সময় পেলিনে? মানুষডার বুড়ো বয়েসে গেলি পরে আমার আর এই দশা হতোনি।—হাঁটুর ওপর হাঁটু

তুলে পা নাচাতে নাচাতে বকতে থাকে কমলী। ওর মাথার কাছেই একটা নিমগাছ। নিমের হাওয়া উড়িয়ে নেয় ওর মাথার তেলহীন রুক্ষ চুল। বেশ আঁটোসাঁটো করে যদিও ও একটা খোঁপা বেঁধে নেয়, তবু যেন শাসন মানতে চায় না অগোছালো বন্য চুলগুলো।

রাস্তায় বেশ ভিড়। রঙ-বেরঙের বাহারে সব জামাটামা পরে যাচ্ছে মেয়েরা। পুজোর প্যাণ্ডেলে ঢাকের বাড়ি পড়ছে। কমলী কান পেতে অনেকক্ষণ ধরে শোনে সেই বাজনা। ঢাক কুড় কুড় কুড়। মুখ দিয়ে শব্দ করতে করতে সেও কিছুক্ষণ সেই বাজনা অনুকরণ করে। বেশীক্ষণ আর ভাল লাগে না যেন। তখন ও জোরে পা দোলায় আর গান গায়। কমলী গাইতে থাকে, ওদের গাঁয়ের যাত্রায় শোনা ওর সেই দারুণ প্রিয় গানটা—

ঝেখন তুমার কেউ ছিল না,
তেখন ছিলাম আমি।
এখন তুমার সব হয়েছে,
পর হয়েছি আমি।

তারপরের লাইনগুলো কমলী একদম ভুলে যায়। ওর আর মনেই পড়ে না। সেই দু লাইনই ও ফের নতুন করে গায়। দু বছর আগে তাদের গাঁয়ে হয়েছিল এই কেষ্টযাত্রা। কমলী ভাবে, তখন কোন কিলাসে পড়ত যেন সে! সিক্স কিলাসে। গাঁয়ের ইস্কুল। টাকার বদলে ধান দিতি হতো মাস্টারের। তা সে-বছর এমন আকাল পইড়লো, বাপ আর ধান দিতি পাইরলোনি। বললে, নিজিরাই খেতি পাইনে তো মাস্টারের দোব কন তে?

সারা দিন মেঘবিষ্টির পর এখন আকাশ বেশ নীল। পরিষ্কার। সেখানে ছিটের মতন অনেকগুলো তারা। যদিও সামনের খোয়া-ভাঙা পথে খুব জল। ওই জল ভেঙে ভেঙেই লোকজন হেঁটে যায়। খলবল খলবল শব্দ হয় জলের। হাজায় কমলীর পায়ের আঙুলগুলো খেয়ে গেছে। ওর আর ইচ্ছে হয় না, এই জল ভেঙে এখনই ঘরে যেতে। ও

আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা গুনতে থাকে, একটা, দুটো, তিনটে—এর মধ্যে কোনটা যেন সন্ধ্যাতারা? সবচেয়ে যে বড় তারাটা? কমলী আপন মনে বলে, সব ভুলে মেইরে দিলি কমলী? ইস্কুলি মাস্টার কি বইলেছিলো মনে নেই?—ও মনে মনে হাতড়ায় মাস্টারের কথাগুলো। কিছুতেই মনে পড়ে না। দূর ছাতা!—ও বিরক্ত হয়। কিছু সময় চুপ করে থাকে। তার পর আবার বলে, মাত্তর দুই বছর আগেও কমলী রে, তুই কি স্বাধীন ছিলি। বনেবাদাড়ে ঘুইরে বেড়াতি কামিনী ফটকে ওগের সাথে। ই বছর মাথা কুটলিও তো কমলী পারবেনি ওগের মতন ঘুইবে বেড়াতি। আগের দিন কি আছে? সে যে এখন বউ, রিশ্‌কাআলা সুদামের বউ।—পুজোর সময় সাত গাঁয়ের ঠাকুর দেখে বেড়াত সে। আর এবার তার সে সময় কোথায়? এ বাড়ির দিদিমণি গেলো ঠাকুর দেখতে। তাকেও সঙ্গে যেতে বলেছিল। মা বলেছিল, চল কমলী, তুই এত খাটিস-খুটিস, তোকে একটু ঠাকুর দেখিয়ে আনি।

কমলী বলল, যাবনি মা। আজ আমার বাড়ি কুটুম আইসবার কথা। বিকেলবেলায় একগাদা রুটি করেছে কমলী। জল ভরেছে। জল ভরে বাসন মেজেছে। মসলা বেটেছে। তারপর হাতে হাতে রান্নার সাহায্যও করেছে। তাই তো মা খুশী হয়ে বললেন, চল কমলী আমাদের সাথে।—মার কথাটা যেন অনেকক্ষণ ধরে বেজে যায় কমলীর কানে। বড় মিষ্টি কথা বলেন মা। কেমন ঝলমলে হাসি থাকে সারাক্ষণ মার মুখে। তা মা আর কথা বাড়াননি। দুটো রুটি আর একটু তরকারি দিয়ে বললেন, এইটে খেয়ে নে।—কমলী যত্ন করে এতক্ষণ জড়িয়ে রেখেছিল আঁচলে। এখন তা বের করে একখানা খেল। আরেকখানা রেখে দিল। আজ সারাদিন ও খায়নি। ওর মনে বড় জ্বালা।

সুদাম এমন করে মারলো দুপুরে! তাকে এক লাথি মেরে ফেলে দিল দাওয়ার ওপর। বলল, ঠেকারে মাগী! মাগীর বড্ড দেমাক।

—কিছু বলেনি কমলী। ও যখন দারুণ রেগে যায়, তখন একদম কথা বলতে পারে না। এই মাগগিগণ্ডার দিনে এতগুলো ভাতব্যঞ্জন নষ্ট হ'ল বলেই না ও দু কথা বলেছিল সুদামকে! তা সে কি অন্যায় করেছিল। কপালের ওপরে উড়ে পড়া চুলগুলো সরিয়ে নেয় কমলী। বিরক্ত হয়ে বলে, জ্বালাতন আমার!—তারপর পা দোলাতে দোলাতে আবার বলে, ও শালাব কুটুম আসার কোথা ছিল কাল দু'খুরী। তা আজও এলোনি। কাল দু'খুরীর গাড়িতে এইসে পৌছনোর কোথা ননদ আর নন্দাইর। এলোনি ভাল। তা একটা খবরও কি দিতে পারে না তাবা আইসবি কি আইসবিনি। সেই ভাতবিন্নুন তো পইচে গেল।—ও যেন কথাগুলো সুদামকেই শুনিয়ে বলল। এক কিলো চালের ভাত রেঁধেছিল কমলী। পাঁচ টাকা করে চালের কিলো। আর সাড়ে তিন টাকা কিলো বেগুনের তরকারি। সুদামের কুটুম ভগ্নীপতি নাকি বেগুন খেতে ভালবাসে তাই। আরও গোটা কয়েক টাকা কার কাছ থেকে যেন ধার করে এনে খানিক মোরল্যা মাছও এনেছিল সুদাম।—ঝেত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড!—বলে কমলী ভুরু কোঁচকায়। যত রাগ গিয়ে পড়ে ওর সোয়ামীব ওপর। তাব কথা শুনেই তো এই হ'ল। সেই ভাতব্যঞ্জন শেষ পর্যন্ত কুকুরের মুখে তুলে দিতে দিতে কমলী বলেছিল সুদামকে, বললুম, আগে থাকতি আঁধবনি, কুটুম আলি পরে আঁধবো, তা না, এমন গাঁইগুই কইরলে।—সুদাম তখন বিড়ি টানছিল মাচার ওপর বসে। ফুঁক করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, তা দুটো ভাত এদেছিস এতেই তোর গতর খইসে গেছে, না?—দপ্ করে জ্বলে ওঠে কমলী। ওব চোখ দুটো যেন বাঘচোখ হয়। গতরের খোঁটা দিলে ও একদম সইতে পারে না। এখন বয়েসটা ওর আঠারো কিনা। দেহে যোবন। মনে পলাশের রঙ। কথায় কথায় ওর রাগ হয়। কারো কথা সহ্য হয় না। আবার তেমনি বেপরোয়া স্বভাব। কমলী সুদামের দিকে তাকিয়ে থাকে। আততায়ী যেমন

ছোরা বের করে তাকায়। ও বলে, এমন গতর দেইখেছিস কুথাও? —ওর কথা শেষ হয় না। সুদাম কুকুরের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। তারপর কিছুক্ষণ চলে ধস্তাধস্তি। কুকুরে কুকুরে মারা-মারির মতন। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় কমলী। ও ছুটকে চলে যায় বাইরে হাঁফাতে হাঁফাতেই। সুদামও আর কথা বলে না। মাচার ওপর বসে ফস করে একটা বিড়ি ধরায়। কমলী দাঁড়িয়ে থাকে দাওয়ার খুঁটি ধরে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। কর্পোরেশনের কলে জল আসে। সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। দেখতে দেখতে রাস্তায় জল জমে। ডোবার সঙ্গে মিশে যায় পথ। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কমলী টের পায়. একজন তাকে হাঁ করে দেখছে। সামনের বাগানবাড়িব চাকব রতন। বতনটার বড্ড লোভ, সুযোগ পেলেই ও লোভার মতন চোখ ফেলে। আর তখন কমলী যেন কেমন হয়ে যায়। ওব গায়ে শীতের কাঁটা দেয়। বুকটা থরথর করে কাঁপে। ও চোখ নামায় মাটিতে, লজ্জায়। আবার ভালও লাগে চোরের মতন ওকে দেখতে। রতন চোখ মারে, কমলীও। ঠোঁটে বাঁকা হাসির ঢেউ তুলে কমলী রতনের চোখে চোখে তাকায়। ভুরুতে ভুরুতে কিসের যেন ইশারা হয় ওদের। রতনটাকে প্রশ্রয় দিতে ওর বেশ ভালই লাগে। সুদামের পায়ের শব্দ শোনা যায় ঘরে। কমলী অবশ্য গ্রাহ্য করে না। ও রতনকে যেমন করে দেখছিল, তেমনিই দেখতে থাকে।

বাবুদের বাড়ির কাজে যাবার সময় হয়েছে। একগাদা এঁটো বাসন ডাঁই করা রয়েছে কলতলায়। কমলীর হঠাৎ খেয়াল হয়, মা নিশ্চয় ঘর-বার করছেন এতক্ষণ। অথচ আকাশের যা অবস্থা! এখনও রাশি রাশি পাথুরে মেঘ। দাওয়ার এক কোণে দাঁড়িয়ে সুদাম, অন্য কোণে কমলী। ওরা দুজনেই বোবার মতন চুপচাপ। কারো সঙ্গে কারো কথা নেই। রতনটা একটা ভীতু। ও পালিয়েছে। কিছুক্ষণ পর সুদাম এসে হাত ধরে কমলীর। কমলী এক ঝটকা

মেরে সরিয়ে নেয় হাত। সুদাম নরম গলায় বলে, তোর বড্ড তেজ।—কমলী সরে যায় কঠিন চোখে তাকিয়ে।

সুদাম আলসে প্রকৃতির। বৃষ্টিফিস্টি থাকলে ও সাধারণত বেরোতে চায় না। ঘরে শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানে। কত সওয়ারীরা হেঁকে যায়, তোষামোদ করে সুদামকে, রিকশার হর্ন বাজিয়ে বলে, ডবল পয়সা দেব, আয় পৌঁছে দে।—তবু সুদাম নির্বিকার থাকে। বিড়ি টানতে টানতে বলে, পারবোনি বাবু, ডবল দিলিউ না। শরীল ভাল নেই।—কিন্তু সেই সুদামই আজ বেরিয়ে যায় বৃষ্টিটা একটু ধরতে না ধরতেই। সদর রাস্তায় তার রিকশা। তার ওপর মড়ার মতন পড়ে থাকল সুদাম। ঘরে আর মন টিকলো না আজ। কমলীও বেরিয়ে পড়ে ওই একহাঁটু জল ভেঙে। নইলে বাবুরা মাইনে দেবে কেন? একটু চায়ের তেষ্টা পায় কমলীর। কিন্তু ঘরে পাতা নেই, চিনি নেই। র‍্যাশন ছাড়া চিনি পাওয়া মুশকিল। খোলা বাজারে চিনি পাওয়া যায় না। কমলীর গায়ে কাঁটা দেয়। একটু যেন শীত শীত লাগে। ঘোলা জল ভেঙে ভেঙে ও প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে। একটু দাম্ভিক চোখে ও তাকায় আকাশে। একটা খারাপ গাল দেয়, হারামজাদা বিষ্টি, না মিন্সের মুখের মিষ্টি? ঝেত জলই ঢাল বাপু, আমার কিছু ক্ষেতি হবেনি।

বাবুদের বাড়ি সকালে চা দেয়, বিকেলে দেবার নিয়ম নেই। তা মা অবিশ্যি লোক ভাল।—কমলী বিড়বিড় করে। মা লোক ভাল, ওগেরে চা খাবার সময় গেলি চা দেয়, উটি দেয়। কপাল ভাল থাকলি ভালমন্দ খাবারও জোটে। আজ কমলীর নসিবে কি আছে কে জানে? সারাদিন উপোস থেকে ওর পেটটা কেমন টেঁসে ধরেছে। সুদাম ঠিকই খেয়েছে। ওরই খাওয়া হয়নি। এত অশান্তি-ফশান্তি হলে কি আর খাওয়া যায়! কমলী গান গায় ভাল। ওর মনটা যখনই খারাপ লাগে, তখনই ও গায়। যেমন এখন, ও মাথায় কাপড় তুলে গুনগুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে যায়।

পরনের কাপড়টা বেশ ভিজেছে। ও শাড়িটাকে হাঁটু পর্যন্ত তুলে একটু নিংড়ে নেয়। কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে বেশ একটা ছন্দের ঢেউ তুলে ও হাঁটে। ওর উরু, নিতম্ব রীতিমতন কাঁপতে থাকে ওর চলার ভঙ্গিতে। ওর উদ্ধত স্তন দুটো শাড়ি ব্লাউজ ভেদ করে ফেটে বেরোতে চায়। খুব চোখাচোখা চেহারা কমলীর। চোখ দুটো দারুণ সুন্দর আর টানা। ডিমের মতন লম্বাটে মুখ। গায়ের রং কষ্টিপাথর হলেও, ওর স্বাস্থ্য যে-কোন মেয়ের ঈর্ষার যোগ্য।

কমলীর গায়ের কাপড় ক্রমেই ভিজতে থাকে। ওর বন্য যৌবনটাকে সামলাতে গিয়ে ও রীতিমতন হিমসিম খায়। রতনটা আবার দাঁড়িয়ে আছে সেই আগের মতন। হ্যাংলার মতন তাকিয়ে থাকে রতন। কমলী মোহময় হাসি ছোঁড়ে।

সুদাম সব লক্ষ্য করে রিক্‌শায় বসে। রতনটা দেখছে কমলীকে। হারামজাদা! বেইল্যেপানা করার আর জাইগা পাউনি অ্যা? পরের বউর শরীল দেখা? অজগরের মতন টপ করে গিইলে ফেইলতি চাও কেমুন?—সুদাম চাপা গলায় বলে। ওর মনে হয়, শালা একটু যেন হাসলও কমলীকে দেখে। হাতের বিড়ি ফেলে দিয়ে সুদাম সোজা হয়ে বসে। ওর কান দুটো খাড়া হয়ে ওঠে। বিড়ির আগুনের মতই ওর চোখ জ্বলতে থাকে। ও ছুটে গিয়ে রতনটাকে মারে এক চড়। ভয় পেয়ে রতনটা পালায়। ওই এক চড়ই যথেষ্ট। বীরত্বের হাসি হাসে সুদাম, ও বেটার গাল এতক্ষণে ফুলে উঠেছে নিশ্চয়। রতনের ওপর অনেক দিনের জমানো আক্রোশের শোধ তোলে সুদাম। তারপর রাগে গজরাতে গজরাতে নিজের বউকে বলে, নষ্ট মেয়েছেলে! ভিজে ত্যানার মধ্যি দে তোর গতর দেখানো কেমুন?—ঘুরে দাঁড়ায় কমলী। সেই একহাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও ব্যঙ্গের হাসি হাসে। ও বলে, পোড়াকপালী মিন্‌সে, মেলা বকিসনি। কাপড় কিইন্যে দিবার ক্ষেমতা তোর আছে? —কথাগুলো বলেই ও আর দাঁড়ায় না।

খানিকক্ষণ পর সুদামও রিক্‌শা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। ও ভেবেছিল, কিছু পয়সা কামাতে পারলে খেনো খাওয়া যাবে। কিন্তু এই কাদা আর জল ভেঙে রিক্‌শা ঠেলা যে কি কষ্ট! পুকুর, রাস্তা আর নর্দমা সব একাকার হয়ে রয়েছে জলে জলে। মেজাজ খারাপ। বসে থাকলেই চিন্তা বাড়ে। তাই এর মধ্যেই রিক্‌শা চালায় সুদাম। পীচ ভেঙে গর্ত হয়ে রয়েছে রাস্তাঘাটে। যদিও এটা হয়েছে এক দিনের বৃষ্টিতে না। অনেক দিনের। ওদিকে আবার সি এম ডি এ-র রাস্তা সারাইয়ের কাজ চলেছে, তাই এদিক ওদিক প্রায়ই গর্ত। সেখানে জল আরো বেশী। সুদাম বুঝতে না পেরে ঘব করে পড়ে যায় সেই গর্তে। কাদাজলে স্নান করে ওঠে। পরনের লুঙ্গি, গায়ের গেঞ্জি সব ভিজে একসা। ভাগ্য নেহাত ভাল। তাই বড় ধরনের কোন গর্তে পড়তে হয়নি তাকে। রিক্‌শার চেন পড়ে গেছে। ও চেন ঠিক করে। চাকার টায়ারের অবস্থাও খুব ভাল না। একটু যেন লিক করছে। তবু সুদাম রিক্‌শা চালায়। একজন সওয়ারী মিলে যায় কপালগুণে। সুদাম নিজে জলে নেমে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায় তাকে। আর নিজের দাম বাড়িয়ে বলে, মুই আর নে যেতি পারবোনি বাবু। আস্তা ভাল না। সুদামের রিক্‌শায় বসেই সওয়ারী চোখ রাঙায়। বলে, কলকাতা শহরের কোন রাস্তাটাই বা বৃষ্টির দিনে ভাল, বলতে পারো?—সুদাম হাসে। বলে, ভাড়া কিন্তু বেশী দিতি হোবে বাবু। সওয়ারী বলে, বেশ বেশ, দেখা যাবে।—কিন্তু বাড়ির সামনে এসে রিক্‌শা যখন দাঁড়ায়,, বাবুর বুলি তখন যায় পাল্‌টে। সুদাম বলে, আট আনা দিলি হবেনি বাবু। এট্টা টাকা দিতি হবে। তখন বাবু তেড়েমেড়ে মারতে যায় আর কি! সুদামও চেঁচায়, খুব র‍্যালা দেখানো হতিছে না? উপগার করতি যেইয়ে এখন কিনা…।—বাবুটি আর মোটেই দাঁড়াল না। ঝন্‌ করে আধুলিটা ফেলে দিয়ে, ঠাস্‌ করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুদাম আরও কিছু

গালিগালাজ করে। তারপর আধুলিটা তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এপিঠ ওপিঠ। সুদাম পরীক্ষা করে নেয়, ওটা অচল কিনা। তারপর ওটা বুক-পকেটে ফেলে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে যায়। মানুষটার অপমানের দান। তবু না নিয়ে উপায় কি?

নিজের ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে সুদাম ডাকে, কমলী! কোন সাড়া পায় না।—পাগলিডে উপুড় হয়ে পইড়ে কাঁইদতিছে না তো?—ও কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে কমলীর গোঙানি। কিন্তু ও কিছুই শুনতে পায় না। বাঁশের দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে সুদাম। অন্ধকার ঘরদোর সব। ঘরে যে কেউ নেই, সেটা ও বোঝে। ওর কপালের রগ দুটো ফুলে ওঠে আবার, রাগে। ও ভাবে, শালী আলোটাও জ্বেলে রেখে যায়নি? দেশলাই জ্বেলে কুপি খোঁজে সুদাম। পায় না। ও হামাগুড়ি দিয়ে মাচার নীচে ঢোকে। কেরোসিন কুপিটা যে বেড়ার পাশেই রয়েছে, তা আর ওর চোখে পড়ে না। সুদামের পায়ের ধাক্কা লেগে ওটা যায় উল্‌টে। ফের আরেকটা কাঠি জ্বেলে কুপি খোঁজে সুদাম। ও দেখতে পায়, সারা ঘর ভেসে যাচ্ছে তেলে। ও একেবারে হায় হায় করে। এঁকেই তেলের দাম চড়া। এক টাকা লিটার। কুপিটা হাতে নিয়ে এক আছাড় মারে সুদাম। ফলে বাকী তেলটাও পড়ে যায় মাটিতে। ও দুপদাপ শব্দ করে বাইরে আসে। তখন পাশের ঘরে ট্রানজিসটার বাজে, ফুলমণির ট্রানজিসটার। সুদাম ভেবে পায় না সে কি করবে এখন? ও বিড়ি ধরিয়ে ভাবে, মেয়েছেলের এত তেজ থাকা ভাল না। বিমলীরও ছিল এই তেজ। পোয়াতি অবস্থায় তেজ করে গেল বাপের বাড়ি, আর ফিরল না। দিন কয়েক পরে খবর এলো, সাপে কেটে মারা গেছে বিমলী। তা ওই লাশ দেখে আর কি হবে? সুদাম যায়নি। সুদাম বিড়বিড় করলো, সেও ভর সন্ধ্যেকালে কাজের তে ফিরতো। মোটে কথা শুইনতোনি। শালা, মেয়েছেলের জাইতটাই ইমুন। আরে বাবা, ঘরের বউরি বাইরি কি আর সাদে

পেইঠে দিই? অভাবের সংসার বইলেই না পেঠাতি হয়?—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুদাম। লোক মারফত ও শুনেছিল, কলার ভেলায় করে নাকি বিমলীর দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে গঙ্গায়। বিড়িতে ফের টান দেয় সুদাম। খক্‌খক্ করে একটু কাশে। পকেট থেকে আধুলিটা বের করে ও দেখে। তারপর আবার রেখে দেয় পকেটে। এই পয়সায় ধেনো গেলা যাবে না ভেবে ওর মেজাজটা যায় আরও খিঁচড়ে। বার দুয়েক হাঁচি দেয় সুদাম। ওর ভয় হয়, শেষ পর্যন্ত জ্বরজারি না হয়। দিনকাল তো ভাল নয়। আগুনের ফুল্‌কি ওড়ে বিড়ি থেকে। সেই বিড়ির আগুনে হঠাৎ ও দেখে, ফুলমণি আসছে। জ্যোৎস্নার আলোয় ধবধব করছে ওর পরনের শাড়িখানা। ফুলমণি পান খায়। ওর মুখে ভুরভুর্ করছে জর্দার গন্ধ। সুদাম আশ্চর্য হয়, ফুলমণি এ সময়? নবীন এখন ঘরে না? অথচ ফুলমণি……। সুদাম মামুলী একটা প্রশ্ন ছোঁড়ে, তুই হেথা?—চেহারা ভাল না ফুলমণির। দাঁত উঁচু। চওড়া মাড়ি। মাড়ির রঙ গোলাপী। গায়ের রঙ কয়লার মতন কালো। শুধু যৌবন আছে, দেহে উত্তাপ আছে ফুলমণিব। সুদামের কোল ঘেঁষে দাঁড়ায় ফুলমণি। কিন্তু সুদামের মেজাজ তো এখন ভাল নেই। তাই ও বলে, মেয়েছাওয়ালেরে বেশী নাই দিতি নাই। বেশী নাই দিলি পরে তারা পেইয়ে বসে।—তবু ফুলমণি বেহায়ার মতন হাসে। ওর শরীরের গন্ধ পায় সুদাম। ও বলে, নবীন কুথা? —ঘরে নেই বেইরেছে।—সুদাম বলে, শালী, এইসেছিস ক্যানে? —ফুলমণি ফিসফিস করে বলে, তুই জানিস নে?—সুদামের মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। ওব গায়ে পচা পাঁকের গন্ধ, ঘাম। কিন্তু বুকের কল্‌জেটা লাফায়। মেয়েছেলে জাতটার ওপরে ওর ঘেন্না দারুণ। তবুও ও জাপটে ধরে ফুলমণিকে। বিমলী কমলী আর ফুলমণি ওর কাছে সব শালীই সমান, এই মুহূর্তে। সুদাম বিড়বিড় করে, শালা, আলো নি‌ভ্য দিলি পরে সব মেয়েছাওয়ালের

চেহারাই এক। ফুলমণি খিলখিল করে হাসে।

ঘরে ফেরার নেশাটা যেন ক্রমেই মরে যাচ্ছে কমলীর। ওর মনে হয়, সারাটা রাতই যদি ও এমনি রোয়াকে বসে কাটিয়ে দিতে পারত! কিন্তু তা কি আর পারবে? একটু পরেই তো সুদাম এসে হাঁকবে। ওর যা বাজখাঁই গলা। আর সেই ডাকে সাড়া না দিলেই চণ্ডাল হয়ে যাবে লোকটা। সুদামের গায়ের যা জোর! কিন্তু গায়ের জোর দিয়ে কি মানুষ মানুষকে আটকাতে পারে? হাত দুটো কোলের ওপর জড়ো করে কমলী ভাবে। ওর ঘাড়ের ওপর ভাঙা এলো খোঁপা। কপালে জ্বলজ্বল করে আধমোছা সিঁদুরের টিপটা। বাড়ির পেছনেই একটা খাটাল। গরুমোষের খাটাল। তাই দারুণ মশা। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে মশা মারে কমলী। ও জোরে জোরে পা দোলায় আর গান গায়, ওর সেই দারুণ প্রিয় গানটা, ঝেকন তুমাব কেউ ছিল না, তেখন ছিলাম আমি···।—ওদিকে মশার গুঞ্জন ওঠে বাতাসে। মশার গান আর কমলীর গান মিলে অদ্ভুত-এক দ্বৈতসংগীত তৈরী হয়। কমলী একটু থামে, সেই গানের প্রতিধ্বনি শুনে একটু হাসে, তারপর আবার গায়—

ওপার হইতে বাঁশরী বাজে,
এপার হইতে শুনি,
আমি তো অবলা নারী,
সাঁতার নাহি জানি।

ষষ্ঠীর বাজনা বাজে। কমলী অন্যমনস্ক হয়। ওর গানের সুর কেটে যায়। ও চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর নিজের মনেই বকে যায়, সে বছর ইমুন দিনিউ ধানের গুলায় নুকোচুরি খেইলেছিলুম কামিনীর সাথে।—কমলী বলে, তা দিদি এইলো শ্বশুরবাড়ি থে। সে তখন ভর পোয়াতি। নড়তি চড়তি তার আঠারো মাসে বছর। কিচ্ছু খেতি পারে না দিদি; শুধু বমি করে, আর

দাওয়ার পরে বইসে বইসে প্যাচাল পাড়ে, ও মুখপুড়ী, অরে কমলী, তুই আর ছুটিস নে রে, তোরে দেইখে আমার হিংসে হয়। অরে আমিও ছুটতুম রে অমনি কইরে।···কমলীর হাসি পায় সে সব ভাবলে। ও নিজের মনেই বকবক করে, দিদিরে দিদি, আজ আমার পায়েও পইড়েছে বেড়ি। আমি আজ তোর সোয়ামীর বউ। পোয়াতি এখনো হইনি, তবে হোব তাড়াতাড়ি। তোর সোয়ামী তিন বেলা ভিরমি খায় আমার গতব দেইখে। তোর তেও আমার যৌবন বেশী বে দিদি, বেশী।—কমলী বকে আর হাসে। ও বলে, ঝে মাচার পরে তুই শুইয়েছিলি রিস্‌কাআলার সাথে, সেই মাচার পবে আমায় নিয়েও জড়াজড়ি করে সেয়ামী।—হি হি করে কমলী আবার হাসে। তারপব সুর করে গান ধরে।

আমি তো অবলা নাবী,
সাঁতার নাহি জানি···

মনটা ভাবী খারাপ লাগে ওর কেন যেন। গানের মধ্যেই বিমলী দিদি আসে। বিমলী দিদির মরা মুখ ভাসে। ও যে আর নেই, সে কথা যেন বিশ্বাস হয় না কমলীর। কমলী বক্‌বক্ করে, হতভাগী মরলি মরলি, ছাওয়ালডারে তেখনি নিলি পারতি। তা না, কইমাছের মতন তারে জিইয়ে রেইখে দিলি। ছাওয়ালডা কত দুঃখু পেইয়ে শেযে গেল।···কমলীর চোখ ফেটে জল আসতে চায়। কিন্তু ও কাঁদে না। ও দু হাতেব মুঠোয় চোখ কচলায়। ও যেন পরিষ্কার দেখতে পায়, একটা বাচ্চার নরম কচি মুখ, কালো কালো ফোলা ফোলা শরীর। হাসিখুশী কাজল-মাখা চোখ। সে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে চায়। কমলী অপলকে তাকায়। ওর বুকের মধ্যে যেন একটা যন্ত্রণার মাছ হেঁটে যায়, ওর মনের মধ্যে টাটায়। তবু এক ফোঁটাও জল ফেলে না চোখের। ও আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে থাকে কিছু সময়। তারপর এক সময় ঘোর কাটে। ও তখন আবার পা দোলাতে থাকে। জোরে জোরে গান গেয়ে ওঠে কমলী—

ঝেখন তুমার কেউ ছিল না…।

দিদিটা মইরে গেল। ঠাক্‌মা বুড়ী জোর করে বে দিল সুদামের সাথে।—কমলী বিড়বিড় করলো।—এক শুক্কুরবারে দিদি মলো, আর তার পরের শুক্কুরি আমার বে হল।—কমলী বলল।

কমলী বলে, আমি মত দিইনি পেরথমে। তা কি কেউ পারে? শেষে ঠাক্‌মা বইললে, জামাইডে পর হয়ে যাবে, তুই বে কর কমলী—আমি বইললেম, আমার মরণ দশা! জামাইবাবুরি সোয়ামী ভাবতি আমার গা গুলোয়।—তা কি ঠাক্‌মা শোনে? তেখন ঠাক্‌মা বইললে, তুই বে না করলি খুকরে দেইখবে কে লা? —কমলী চুপ করে।

ভয়ানক মশা। মশাগুলো যেন চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে ওকে। কমলী দু হাত দিয়ে মশা তাড়ায়। আর বলে, তা ঝা করার জন্যি মোকে তোরা পেইঠেছিলি, তাই কি করতি পেইরেছি? ছাওয়াল পাল্‌লুম কুথায়? আমি তো এইসে দেখি, ফুলমণি তারে আইগলে রেইখেছে। ফুলমণির শুকনো মাইয়ের বাঁট চাটতেছে খোকা, আমার কাছে মোটে আসতি চায় না। আত্তিরি থাকত ও তার কাছে। শেষে দুই দিনির পেট খারাপ আর জ্বরে সেও গেল।—কথাগুলো বলে, আর কমলী হাঁফায়।—আবাগীর বেটী, মর মর!—ও গালাগাল দেয় ঠাকুমাকে। তার পর নিজের পাগলামিতে ও নিজেই হাসে।

হঠাৎ ওর খেয়াল হয়, ফুলমণি দাঁড়িয়ে আছে পথে। কমলীকে দেখতে পায় ফুলমণি। ও এক গাল হেসে এগিয়ে আসে। কমলী ওকে দেখেও না দেখার ভাব করে একটা নিমের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে ও দাঁতে কাটতে থাকে। আর থুহ্ থুহ্ করে থুত ফেলে। কমলী আড়চোখে দেখে, খুব কাছাকাছি এসে গেছে ফুলমণি। ও যেন সাপের মতন বুক টেনে টেনে খুব সাবধানে এগিয়ে আসছে। কমলীর ডান চোখ লাফায়। ওর মনে হয়, ওটা একটা দারুণ

অমঙ্গল। কমলী তাড়াতাড়ি বাঁ পায়ের ধুলা নিয়ে ডান চোখে ঘষে। তবু চোখ নাচা বন্ধ হয় না ওর। ফুলমণি হাসে। সে ভালমানুষের মতন মুখ করে বলে, কি লা, ঠাকুর দেইখতে যাস্‌নি? —কমলী যেন কথাটা শুনতেই পায়নি এমনি ভাব করে। ও যেমন নিমের পাতা দাঁতে কাটছিল তেমনি কাটতে থাকে। ফুলমণি পান চিবোতে চিবোতে বলে, যা দিকিনি, চুলটুল বাঁধ। পুজোগণ্ডার দিনি অমন পাগলীর মতন থাকিসনে।—ফুলমণির এই গায়ে-পড়া ভাবটা কমলীকে রীতিমতন অবাক করে।—দেমাকী মাগী হঠাৎ ইমুন নরম?—কমলী ভাবে। কিছু সময় ও তাকিয়েই থাকে ফুলমণির মুখের ওপর। ও যেন দেখতে পায়, সেখানে ব্যভিচারের স্পষ্ট একটা ছায়া। ওর চোখের পাতা আর পড়ে না। ফুলমণি কেমন ভয় পেয়ে যায়। সে থতমত খায়। তবু মুখে হাসি টেনে বলে, কি লা, কি দেখতিছিস?—কমলী কোন জবাব দেয় না। ও খুঁটিয়ে দেখে ফুলমণিকে। ফুলমণির চেহারায় অবসাদ, ক্লান্তি। ফুলমণি পান চিবোয়। পানের পিক ফেলে বলে, কথা বইলবিনি?—কমলী বলে, যা মাগী, ভাগ! তুই একটা পাপ।—ফুলমণি চমকে ওঠে। ওকে ঘাঁটাতে আর সাহস হয় না ওর। সে আস্তে আস্তে চলে যায়।

কমলীর দারুণ রাগ হয় সুদামের ওপর। রাগে, ঘেন্নায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয় কমলীর। বুকের মধ্যে একরাশ যন্ত্রণার পোকা। ওরা যেন দাপাদাপি করে। ওর চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। যত আক্রোশ গিয়ে পড়ে ওর সোয়ামীর ওপর। কমলী কিছুতেই বোঝে না যে, ভালবাসার মানুষের ওপর বেশী রাগ দেখাতে নেই। তাকে বশ করতে হয় ছলাকলায়। ও দুপদাপ শব্দ করে হেঁটে যায় ঘরের দিকে। আজ ও নখে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলবে সুদামকে। দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দেবে ওর বিছানাপত্র, ঘর। কমলী শেষ করে ফেলবে ওই নরককুণ্ড।

কমলী হেঁটে যায়। যেতে যেতে ও শোনে, ষষ্ঠীর ঢাকের বাজনা। ওরই বুকের মধ্যে যেন বাজে বাজনাটা। বাগানবাড়ির রতন এসে দাঁড়ায় পথে। ওর পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকে রতন। বিকারগ্রস্ত রোগীর মতন কমলী দেখে তাকে। রতন চোখ টেপে, কিন্তু কমলী কোন সাড়াই দেয় না। রতনের যেন অবাক লাগে, আজ এত কাছে পেয়েও কমলী দূরে সরে যায় কেন? আবেগে গদ্‌গদ হয়ে রতন বলে, পালিয়ে যাবি আমার সাথে? আমি তোরে সুখ দেব। তোর বাঁচবার সাধ যায় না রে?—কমলীর চোখে বান ডাকে। কিন্তু ও হাতের কঠিন তালুতে মুছে ফেলে জল। কমলী আর্তনাদের মতন করে বলে, না, তোরা সব এক। সুদাম যা, তুইও তাই। ব্যাটাছাওয়াল জাতটাই ইমুন। আমি খেইটে খাব। মেয়েছাওয়ালের যেতক্ষণ গতর, তেতক্ষণ কদর।

ঊর্মি

ঊর্মি বসে বসে খাতা দেখছিল। ওর ভুরু দুটো ধনুকের মতন বেঁকে উঠছে মাঝে মাঝে যখন লাল পেন্সিলের কড়া দাগে খাতার প্রায় প্রতিটি পাতাই ভরে যাচ্ছে। এত ভুল লেখে মেয়েরা! আলেকজাণ্ডার কালিন্দী পর্বত অতিক্রম করে ভারত আক্রমণ করেছিলেন! হিন্দুকুশ লিখতে লিখেছে কালিন্দী। আর ওদিকে আকবরের সভার নবরত্নের মধ্যে একজন ছিলেন যদুভট্ট। কোথায় তানসেন লিখবে, তা না, লিখেছে যদুভট্ট; এসব কথা পড়ে ঊর্মি হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। স্কুলে আর পড়াতে ভাল লাগে না। দু দিন পর পর শুধু উইক্‌লি টেসট আর মান্‌থলি টেসটের ঘটা। গাদা গাদা খাতা দ্যাখো। আর তারপর যদি একটাও ভাল খাতা হয়। অথচ ক্লাসে পড়ানোর সময় ওরা এমনভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন মিস্‌ যা বলছেন, সব বেদবাক্যের মতন শুনে যাচ্ছে। ঊর্মির মনে হয়, প্রেম করে করেই মেয়েগুলোর এই অবস্থা হয়েছে। অল্প বয়েসে পাকামী করলে যা হয়। আজকাল সেভেন এইটের মেয়েরাও যা পাকা! এই তো সেদিন সুগতর সঙ্গে বাঁধ দেখতে গিয়ে ঊর্মি কয়েক ডজন ছাত্রীর মুখোমুখি হয়েছিল, যাদের সঙ্গে রয়েছে অতিআধুনিক হিপিমার্কা যুবকেরা। ঊর্মিকে দেখেও ওদের কোনরকম সঙ্কোচ হয়নি। বরং অজস্র গুড ইভনিং শুনিয়ে শুনিয়ে ওরা মিসকে পাগল করে তুলেছিল। হলের অন্ধকারে ওদের চাপা হাসি আর ফিস্‌ফিসানির জ্বালায় ঊর্মি অস্থির হয়ে উঠেছিল। সুগতকে নিয়ে পালিয়ে আসতে পারলে যেন বাঁচে।

সকাল থেকে একটানা বৃষ্টির পর এখন একটু রোদ উঠেছে।

অবশ্য বাতাসে বাদলার ছোঁয়া এখনও রয়েছে। তবুও ঘরে ফ্যান চলছে। উর্মির গরম বোধটা একটু বেশী। তারপর আবার এই খাতার বোঝা ওকে রীতিমত কাহিল করে ফেলেছে। মনে মনে ছটফট করছে, কখন এই দায় থেকে সে উদ্ধার পাবে। কলেজে একটা কাজ পেলে হত। প্যানেলে ইন্টারভিউ দিয়েছে কিন্তু কোন লাভই হয়নি। সুগতরও কোন একটা হিল্লে হল না। সমানে ইন্টারভিউ দিয়েই চলেছে। চাকরি আর হচ্ছে না। এখন দিল্লিতে গেছে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়াতে একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। কাজটা ওর হবে বলে মনে হয় না। একটা পাকাপাকি কাজ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করতে পারছে না সে উর্মিকে। এদিকে বিয়ের অজস্র সম্বন্ধ আসছে ওর। বাবা-মার কথার অবাধ্য না হয়ে পাত্রপক্ষের কাছে দু-একটা ইন্টারভিউও দিয়েছে উর্মি। তার মধ্যে একজন সিভিল এঞ্জিনিয়ারও আছেন। তিনি এখন মাইথনে। আর সব সম্বন্ধগুলো নাকচ হয়ে গেছে। শুধু এইটেই ঝুলছে। কেননা, পাত্রের বড় বেশী ভাল লেগে গেছে উর্মিকে। মা বাবারও ইচ্ছে এখানেই হোক। বেকার এঞ্জিনিয়ার সুগতর হাত থেকে তাঁদের মেয়েটা অন্তত রেহাই পাক। অথচ উর্মির পছন্দ নয় সেই পাত্রকে। সুগতকে তার জীবনের কোন একটা সমস্যা বলেই মনে করে না উর্মি। ওকে যে বিয়ে করতেই হবে, এমন কোন দাসখতও লিখে দেয়নি সে। আসলে ভদ্রলোককে ওর খুব উন্নাসিক মনে হয়েছিল। খাবার প্লেট সামনে রেখে মা যখন তাকে বললেন, খাও বাবা, লোকটা তখন চাবির রিঙ দোলাতে দোলাতে বলেছিল, অনলি এ কাপ অব টি।—ব্যাপারটা খুব বিসদৃশ লেগেছিল উর্মির। সাধারণ এক বাঙ্গালী বয়স্কা মহিলার এই আন্তরিকতাটুকু প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে আর যাই হোক, বাহাদুরী কিছু নেই। টেলিফোন বেজে উঠল হঠাৎ।

উর্মির ইচ্ছে করছিল না। হলঘরে গিয়ে ফোন ধরতে হবে।

সিম্কুটা করছে কি ? ফোনটা ধরতে পারছে না ? কিছুক্ষণ আগে তো ওর কলরব শোনা যাচ্ছিল, ডায়ভুকে নিয়ে পিংপং বল খেলছিল সিম্কু। এখন বেলা দুটো। এই অসময়ে ফোন করলই বা কে ? সুগত সাধারণত এই সময় ফোনটোন করে। কিন্তু সে তো এখন কলকাতাব বাইবে। ফোনটা বেজেই চলেছে। বেজে বেজে থেমে গেল ফোন। আবার নতুন কবে রিঙ হতে থাকল। উর্মি ততক্ষণে আবেকখানা খাতা টেনে নিয়েছে। ও জোরে চেঁচিয়ে ডাকল, সিম্কু, সিম্কু !

সিম্কু বাইবে গাড়িবাবান্দা থেকে চেঁচিয়ে বলল, অত চেঁচাচ্ছিস কেন পিসি, ষাঁড়ের মতন ?—উর্মি থমকে গেল। অতটুকু ছেলেব মুখে কী কথা ! ও বলল, এই, খুব পেকেছিস তো। যা, ফোনটা ধর।

সিম্কু তবুও ফোন ধরল না, দবজার কাছে এসে বুড়ো আঙুল দেখালো। তাবপর ডায়ভুব চোখেব সামনে পিংপং বলটা নাচাতেই থাকল। ডায়ভুব ঘেউ ঘেউ বাড়ছে। প্রচণ্ড জোবে লাফালাফি করছে। ওদিকে টেলিফোনেব আর্তনাদ। উর্মির মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ও দ্রুত গিয়ে ফোনটা ধরল। উর্মি বললো, হ্যাল্লো। —ও-পাশের পুরুষ কণ্ঠ বলল, আপনি মানে উর্মি, উর্মি তো ? —চিনতে পাবল না উর্মি। তবু বলল, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি ?

—আমি। আমায় চিনতে পারছেন না ? আমি মানে…। ততক্ষণে চিনে ফেলেছে উর্মি।

কিন্তু চিনতে পেবেও ও না-চেনার ভাবই করলো। ওর বুকের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে তখন। ওর পায়ের তলা ঘামছে। হাত কাঁপছে। ও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। রিসিভার কানে চেপে ও তাকিয়ে আছে। ঘবের সিলিং দেখছে। ফ্যানটা বন বন কবে ঘুবছে। ফ্যানের ব্লেডের সঙ্গে ফরফর করে উড়ছে সিম্কুর ছেঁড়া ঘুড়িটা। দেওয়ালঘড়ির কাঁটা দশটার ঘরে থমকে আছে। বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়িটা অনেকক্ষণ। আজ চাবি দেওয়া হয়নি।

জয়ন্তানুজ সেন এতদিন পর কি মনে করে ফোন করছে? ঊর্মি ভাবছে। সেই লাজুক মুখচোরা যুবক, পাপড়ির দাদা। ঊর্মি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সে এতদিন পর শেষ পর্যন্ত ফোন করল! এই সাহসটুকু সঞ্চয় করতে ভদ্রলোকের পাঁচ বছর লেগে গেল! মনে হয় যেন একটা যুগ। আশ্চর্য!

ডায়ভু অসম্ভব গোলমাল করছে। এই মুহূর্তে সিম্‌কুটা কি একটু চুপচাপ থাকতে পারছে না?—আমি জয়ন্তানুজ সেন।—ও পাশের ভরাট গলায় বেজে উঠল নামটা। ঊর্মি বলল, কি ব্যাপার? (ঊর্মি ঠিক বুঝতে পারল না ওর গলার স্বরটা একটু কেঁপে উঠল কিনা) জয়ন্তানুজ বলল, আপনাকে বড় প্রয়োজন।

—সেকি! কেন?

—সব কথা কি ফোনে বলা যায়?—একটু যেন বাধো বাধো গলায় জয়ন্তানুজ বলল।

—বুঝতে পারছি না, এতদিন পর আমার সঙ্গে এমন কি কথা থাকতে পারে?

ওদিকের কথা থেমে গেল। তারপর দু পক্ষেরই কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস কানে বাজলো ঊর্মির। ওর বলতে ইচ্ছে হল, কাপুরুষ। কিন্তু ও বলতে পারল না। জয়ন্তানুজ বলল, আসুন না বিকেলে গড়িয়াহাটের মোড়ে? আপনাকে খুব দরকার।

—দরকারটা কি হঠাৎ আজই হয়ে পড়ল?—কৃত্রিম কাঠিন্যের সুর ঝরে পড়ল ঊর্মির গলায়। ও তরফের কোন জবাব নেই। ঊর্মি বলল, হ্যালো! হ্যাল্‌লো!

—শুনছি, বলুন।

—আমার সময় বড় কম। স্কুলের মেয়েদের খাতা নিয়ে ব্যস্ত আছি।

—বিরক্ত না করে উপায় নেই। আসবেন ঠিক ছটায়? ট্রেডার্স

কথা শেষ হল না। লাইনটা কেটে গেল। রিসিভার নামিয়ে রাখলো উর্মি! টেলিফোন বিভ্রাটটা যেন আজকাল একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি ভাবল জয়ন্তানুজ কে জানে! হয়তো ভাবতে পারে উর্মি ইচ্ছে করেই লাইন কেটে দিয়েছে। ছি, এতখানি অভদ্র সে নয়। ওর বুকের মধ্যে যেন ভারী একটা রোলার চলে যাচ্ছে। অসহ্য একটা চাপা যন্ত্রণা টের পাচ্ছে উর্মি। উর্মি ভাবছে, এতদিন পর ও কেন এলো? বেশ তো কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। এতদিন যে লোক তার কোন খোঁজখবর রাখেনি, তার নরম মনটা নিয়ে খেলা করেছিল পাঁচ বছর আগে, সেই লোকটার আজ হুম্ করে টেলিফোন না করলেই কি চলত না? ওর ঘাড়ে এই যন্ত্রণার বোঝা চাপিয়ে দেবার কি অধিকার ছিল? লোকটা জানতে পারল না, সে ওর কতখানি ক্ষতি করেছিল। ওব সমস্যাহীন জীবনে সে যে নতুন করে সমস্যা তৈরি কবল।

বাইরে বৃষ্টিব আকাশ। আকাশে এখন স্লেটের মতন মেঘ। উর্মি ভাবছে, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিসটা কি খুব বেশী দূরে? বাড়ির সামনে সদর রাস্তা। অসংখ্য বাস ছুটছে এসপ্ল্যানেড পাড়ায়। এ সময় বেরুনো খুব কষ্টকর হবে? আজ ট্রাম স্ট্রাইক। একটু না হয় ভিড়ই হবে বাসে। মিনি বাসও তো রয়েছে কিংবা ট্যাকসি। ছটার আগেই যদি ওর কাছে পৌছে যাওয়া যায়? একেবারে ওর অফিসের চেম্বারে? তারপর ওখান থেকে যদি বেরিয়ে পড়া যায়! ইডেনের নির্জন ছায়ায়, বার্মিজ প্যাগোডার কাছে বেশ নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লে বেশ হয়। কিন্তু কি কথা বলবে প্রথমে? কি কথা দিয়ে শুরু করবে? ঠিক তেমন মুহূর্তে কি কোন কথা বলা যায়! সিগারেটের আগুনের মত যে লোকটা একটু একটু করে পুড়িয়েছে তার অষ্টাদশী মনটাকে, সেই মানুষটাকে কি ক্ষমা করা যায়? ও হয়ত খুব

রূঢ়ও হতে পারবে না। অভিমান, যন্ত্রণা, আবেশ সব মিলে ও যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে যাবে। যাকে এক সময় প্রত্যেক সকালে, প্রত্যেক সুন্দর সন্ধ্যায় মনে মনে আবতি করেছে, কামনা করেছে, সেই দুর্লভ মানুষকে হঠাৎ এভাবে পাওয়াটাকে ওর লটারীতে জেতা ভাগ্যফলের মতন মনে হচ্ছে। ঠোঁট কেটে কেটে হাসল উর্মি। নিজেকে এখন ওর খুব দামী মনে হচ্ছে, কোন একজনের কাছে নিজেকে দুর্লভ ভেবে। হয়ত সেও তাকে অমনি করেই চেয়েছিল, এত বছরেও ভুলতে পারেনি। আশ্চর্য! আমরা যদি একে অন্যের মন দেখতে পেতাম! উর্মি ভাবছে, যদি কোনও ক্যামেরায় সেই মনের ছবি তোলা যেত! কি বলতে চায় ও এতদিন পর? আবেগ, সেন্টিমেন্টের কথা, নাকি রোমান্টিক মনের কয়েক টুকরো ফুলঝুরি? যে জিনিসটা ছেলেদেব কাছে দারুণ একচেটিয়া। বড় অসময়ে কেটে গেল লাইনটা। উর্মির আফশোস হচ্ছে ওকে দুটো কথা শোনাতে পারল না বলে। ও মনে মনে আওড়ালো জয়ন্তানুজের সংলাপ-গুলো, এমন কি তাঁর অসমাপ্ত কথাটাও। ওর খুব ব্যঙ্গ করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওকে। ওকে অপমান কবতে ইচ্ছে হচ্ছে। মুখের ওপরে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমি অরেকজনকে ভালবেসেছি। আমরা শিগগিরই বিয়ে করছি। অথবা সব থেকে সুন্দর অপমান হয়, যদি ওর সঙ্গে আজ দেখা না করা যায়।

সিমকুটা সমানে ক্ষেপাচ্ছে ডায়ভুকে। তার চেঁচমেচি ক্রমেই বাড়ছে। বেড়ালের মতন লেজ ফুলিয়ে ও ঘরর্ ঘরর্ আওয়াজ তুলছে। খুব অসহ্য লাগছে উর্মির। অন্যদিন হ'লে সেও হয়ত ভিড়ে যেত সিম্কুর দলে। কুকুবটাকে উত্তেজিত করত। কিন্তু আজ আর পারল না ওদের সুরে সুর মেলাতে। ও ঠাস করে একটা চড মারলো সিম্কুর গালে। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল সিম্কু। কাঁদতে কাঁদতে বলল—দাঁড়া, আমি দাদুকে বলে দেব। যা না, বলে দে। উর্মি কেমন ছেলেমানুষ হয়ে উঠল। ও যেন সিম্কুর

বয়েসী হয়ে গেছে। এখন এই মুহূর্তে। সিম্‌কুকে আরেকটা চড় মেরে ডায়ভুর গলায় চেন পরিয়ে বেঁধে দিল উর্মি রেলিঙের সঙ্গে। সিম্‌কু চেঁচালো কাঁদলো। অভিমানী চোখে তাকাল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল দাত্বর কাছে। উর্মি অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, ওব অভিমানী জলভরা চোখ তুটো। অন্য-দিন হলে ওর বুক টন টন করত। ও কিছুতেই পারত না সিম্‌কুকে এভাবে কাঁদাতে। কিন্তু আজ যেন ওর পক্ষে সবই সম্ভব। এই তো কিছুক্ষণ আগেও ছিল অন্যজগতে। সিম্‌কু কত বায়না করেছিল, তাকে সব থেকে বেশী প্রশ্রয় দেয় পিসি। কিন্তু টেলিফোনটা আসার পর থেকেই উর্মি কেমন বদলে গেল। ও বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। খাতা দেখায় মন দিতে পারছে না। ওদিকে স্প্যানিয়াল কুকুরটার চেঁচানি বাড়ছে। তার কান্না, সিমকুর কান্না, বাসের শব্দ মিলে ওর কানের মধ্যে বিচিত্র এক অর্কেস্ট্রা বেজে চলল। নিজেকে এত গোলমালের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেও একটা মুখ ও ভুলতে পারল না। সে মুখ জয়ন্তানুজ সেনের। কেমন দেখতে হয়েছে? উর্মি ভাবছে, ওর স্বাস্থ্যটা কি আরেকটু ভাল হয়েছে? না, তেমনি রোগাই রয়েছে? চশমার পাওয়ারটা নিশ্চয় আরেকটু বেড়েছে! চোখ তুটো কী দারুণ উদাসীন ছিল। ওই চোখ তুটোই তো তাকে প্রতারণা করেছিল, উর্মির মনে হয়। ওই তু চোখের এমন ভাষা ছিল, যা উর্মিকে তুর্বল করে ফেলেছিল। ওর দিকে অপলক চেয়ে থেকে থেকে নীরবে ভালবাসা জানিয়েছিল। অথচ সেই চোখের মানুষ কোনদিনই কাছে আসেনি।

তখন কলেজ জীবনের প্রথম দিনগুলো। পাপড়িটা প্রায়ই টানতে টানতে নিয়ে যেতে থাকে। পাপড়ির পাশের ঘরটাই ছিল তার দাদার পড়ার ঘর। তু ঘরের মাঝখানে একটা খোলা দরজা। হাওয়ায় উড়ে উড়ে যেত ছিটের পর্দা। উর্মির সঙ্গে তার চোখা-চোখি হয়ে যেত কতবার। প্যাকিং বাক্স কেটে কোনরকম একটা

টেবিল করা হয়েছিল। তার পড়ার টেবিল। সে বসত একটা সস্তা কাঠের চেয়ারে। তার বই থাকত কেরোসিন কাঠের তৈরী বুকসেলফে। নিতান্তই সাদামাটা জীবন। পাপড়ির বাবাকে দেখলে মনে হত জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত নায়ক। নেহাৎ ভাল ছেলে ছিল বলেই জিওলজি নিয়ে অত পড়াশুনো করার সুযোগ পেয়েছিল জয়ন্তানুজ, পাপড়ির দাদা। ফি মাসে মাসে সে স্কলারশিপ পেত। বাকী টাকাটা জোগাড় করত টিউশনি করে। নিজের পড়ার খরচ চালাত এতে এবং সেই সঙ্গে বোনেরও। পাপড়ি গল্প করত। তার দাদার গল্প। বইটই পড়ে তার দাদা।

পাপড়ি বলত, তার দাদা গল্প লেখে।

পাপড়ি বলত, তার দাদা কবিতা লেখে।

পাপড়ি বলত, তার দাদা ছবি আঁকে।

পাপড়ির মুখে তার দাদার প্রশস্তি শুনতে শুনতে ঊর্মি একেবারে হাঁ হয়ে যেত। একথা তখন ওর মাথায় আসত না যে, ওই বয়েসে বাঙলাদেশের অনেক ছেলেই কবিতা লেখে, গল্প লেখে। ওটা এমন-একটা বয়েস, যে-সময়ে অ-কবিকেও কবি করে ছাড়ে, অরসিকও রসিক হয়।

পাপড়ির মুখে তার দাদার গুণের কথা শুনতে শুনতে এক ধরনের ভালবাসা জন্মেছিল ঊর্মির মনে। বৈষ্ণব সাহিত্যে একেই তো বলে গুণগত প্রীতি। নলের প্রতি দময়ন্তী আকৃষ্ট হয়েছিল যেমন। দময়ন্তীর মনেও জন্মেছিল এই গুণগত প্রীতি। ঊর্মিকে একলা ঘরে রেখে নানা ছল করে বেরিয়ে যেত পাপড়ি। উড়ন্ত পর্দার ফাঁকে ওদের এই চোখাচোখির খেলাটা বেশ লাগত ঊর্মির। মাঝে মাঝে কয়েক পলক তাকিয়েও থাকত ওরা। সে চাউনিতে ছিল কিছু বিস্ময়, কিছু কৌতূহল, একটু মুগ্ধতা। তখন ঊর্মির উদ্ধত যৌবন। ভালবেসে দেউলে হবার মতন মন। শরীর মন সব কিছু দিয়েই ও চাইত তাকে। ও কতদিন আশা করেছে ও ঘরের মালিক এগিয়ে আসবে।

দু ঘরের মাঝখানে তো সামান্য এক চৌকাঠ। একটু বেরোন কি সম্ভব হবে না? কিন্তু সম্ভব তো হ'ল না কোনদিনই। দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে ঊর্মি। ওর পিপাসা বেড়েছে দিন দিন। তবু সে আসেনি। শেষ পর্যন্ত একটা সলজ্জ চাউনি ছুঁড়ে জয়ন্তানুজ বইয়ের খাতায় মুখ ডুবিয়েছে। ফার্স্ট ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত তো এই করে করেই কেটে গেল। সে এল না। কিন্তু আজ এলো, যখন ওর প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। ফার্স্ট ইয়ারের সেই মনটা তো আর নেই। নেই সেই অভিসারে যাবার মতন মনের প্রস্তুতি।

ভাল লাগছে না ঊর্মির। নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে আজ। ও আবার খাতা দেখায় মন দিল। সুগত দিল্লী গেছে। কাল পরশুর মধ্যেই ফেরার কথা। আজকের এই ঘটনাটা যদি সুগতর কানে যায়, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে ভাবতে পারে না ঊর্মি। যদিও সুগতর সঙ্গে এমন কোন শর্ত করেনি ঊর্মি যে তাকেই বিয়ে করবে। বরং ও বলেই রেখেছে, মা বাবা জোর করলে অন্য জায়গায় বিয়ে করেও ফেলতে পারে। অবশ্য সুগত সে কথা বিশ্বাস করে না। ও হেসে উড়িয়ে দেয়। ও বলে, তোমার মতন সিনসিয়ার মেয়েরা ওসব বিট্রে-ফিট্রে করে না। আসলে করার মতন হিম্মত নেই।

ঊর্মি বলে, যদি কারো সঙ্গে প্রেম-টেম করি?

—প্রেম করবে তুমি? আমিই তো তোমায় হাতে খড়ি দিলাম।

—যদি তোমার আগেও আর কেউ দিয়ে থাকে?

—দিয়ে থাকলেও তা ধোপে টিকবে না।

হেসেছিল ঊর্মি। ভেবেছিল, সুগতর এই শেষ কথাটাই হয়ত কাজে লেগে যাবে। ঊর্মির মনে হয় সুগতর ভালবাসাটা যেন এক ধরনের জুলুম। ও জোর করে কেড়ে নিতে চায় ঊর্মিকে। ও দিল্লী থেকে ফিরলেই আবার সেই ছকে বাঁধা রুটিনের জীবন। সকালে স্কুল, দুপুরে বাড়িতে বসে থাকা, বিকেলে রামকৃষ্ণ মিশন

কালচারাল ইনস্টিটিউটের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। তারপর বই পালটানো আর বই নেওয়ার খেলাটা খেলতে হবে অন্তত কিছু সময়, যতক্ষণ না সুগত এসে দাঁড়ায়।

তারপর দুজনে মিলে রসকোয় গিয়ে গিয়ে বসা। নইলে আরেকটা কোন সস্তার রেস্টুরেন্ট। খুব বেশী দামী রেস্তোরাঁয় যাবার ক্ষমতা নেই ওদের। কারণ, সুগত বেকার। চোখে চোখে তাকিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার মতন ছেলে সুগত নয়। তার চেয়ে উর্মির ঠোঁটে ঠোঁট রেখে তার শরীরের উত্তাপটুকুর স্বাদ নেওয়াটাকে সে অনেক বেশী মূল্য দিয়ে থাকে। রেস্টুরেন্টের বেয়ারাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বখশিস দেয। তার কারণ যাতে সে অনেকক্ষণ বসার সুযোগ দেয় তাদের এই পর্দা-ঢাকা কেবিনে। শরীরের চাহিদা পুরোপুরি মেটে না বলে সুগত দারুণ যন্ত্রণা পায়। ও ভেতরে ভেতরে ছটফট করে। উর্মি কিছুতেই পুরোপুরি ছেড়ে দেয় না নিজেকে। তবু সুগতর এই স্পর্শ, ওর উত্তাপ তার মন্দ লাগে না। সে যাকে চেয়েছিল তাকে জীবনে পায়নি বলেই যেন ও নিজেকে আরো বেশী ছেড়ে দেয় সুগতর কাছে। এক সময় শরীরের উত্তেজনা মিটে যায়। তখন এক ধরনের ক্লান্তি আসে ওর মধ্যে। তখন সুগতকে ওর খুব বিশ্রী লাগে। অথচ পরদিন আবার গিয়ে দাঁড়ায় সেই নির্দিষ্ট জায়গায়। সুগতর জন্যে অপেক্ষা করে। ওর প্রয়োজনটা যেন উর্মির কাছে এক ধরনের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর কাছে যেতে হবে। ওকে সঙ্গ দিতে হবে। আর ওকে এভাবে পেয়ে সুগতরও অধিকারবোধটা দিন দিন প্রবল হচ্ছে। ও যেন স্বামীসুলভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে ওর ওপর কর্তৃত্ব খাটায়। প্রায় ওর কথামতই চলতে হয় উর্মিকে। এ যেন সেই সীতাকে লক্ষ্মণের গণ্ডী কেটে দেওয়া—"এই গণ্ডীর বাইরে গেলেই তোমার ভীষণ বিপদ।" —সুগতর তৈরী গণ্ডীর মধ্যে পরিক্রমণ করতে হয় তাকে। অথচ ওর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। সুগতকে

অস্বীকার করতে। কিন্তু ও পারে না। বিবেকটা ওর মধ্যে যেন বড় বেশী উঁকি মারে। শুধু তাই নয়। উর্মি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেছে, সুগতকে ও ভালবেসেছে। দিনের পর দিন ওর সান্নিধ্যে আসার ফলে এই প্রীতির জন্ম হয়েছে। একেই তো বলে বৈষ্ণব সাহিত্যে সাঙ্গিক প্রীতি। সুগত খুব হাল্কা ধরনের চটুল চপল কথা বলতে ভালবাসে। উর্মির প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। ওর ভালবাসা মনকে খুব স্পর্শ করে না উর্মির। তবু ওর সঙ্গলাভের প্রয়োজন হয়। খুব গভীর কিছু ও আশা করে না সুগতর কাছে।

ও ঠিকই এসে দাঁড়াল বিকেলে। না এসে পারল না। বেরনোর আগে ওর মন যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, আসবে কি আসবে না। শেষ পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটা যখন ছটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে, তখন ও অন্যমনস্কভাবে শাড়িটা পালটালো। বাড়ি থেকে পৌনে ছটায় বেরিয়ে ও কিছুতেই এসে পৌঁছুতে পারল না সময় মতন। বাস-টাস সব ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, আসছে। পাতাল রেলের রিহার্সাল চলছে এখন সারা কলকাতায়, তাই ট্রাম বাসের রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সব জায়গায় লাইন বসানো হবে সে সব জায়গা থেকে।

গড়িয়াহাটে ভিড়। রোজই যেমন থাকে। ফুটপাথে কাতারে কাতারে মানুষ, দোকান। রঙ-বেরঙের পোশাক আর যুবক-যুবতীর জৌলুস দেখতে দেখতে ও এসে দাঁড়ালো ট্রেডার্স অ্যাসেমব্লির নীচে। ও আজ ফলসা রঙের একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে। গায়ে সেই রঙেরই ব্লাউজ, এলো খোঁপা। এই সাধারণ সাজগোজের মধ্যেই ওকে সুন্দর মানিয়ে যায়। ওর মিষ্টি চেহারায় একটা মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত ছাপ। ওর চলাফেরায় রয়েছে আভিজাত্য। এজন্যই সুগত নাকি ওর প্রেমে পড়েছিল। কথাটা ভেবে একটু হাসল উর্মি।

ঘড়ির কাঁটা আরেকটু এগিয়ে চলল। যার জন্যে ওর অপেক্ষা সেই মানুষের দেখা নেই। অতএব ওকে আরো কিছু সময় দাঁড়াতেই হ'ল। ও ভাবল, ও কি জায়গা ভুল করল? অথবা সময় ভুল?

নাকি আধঘণ্টা দেরী করেছে বলে সে এসে ফিরে গেল? এ সব ভাবতে ভাবতে ক্রমেই হতাশ হতে থাকল উর্মি। কেমন এক বেদনাবোধে ওর বুক ভারী হয়ে উঠল। এবং ও অনুভব করতে পারল, এতদিন পরেও ও জয়ন্তানুজকে ভোলেনি। কিন্তু আজ যদি ওর সঙ্গে দেখা হয় ওকে তো ফিরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছে উর্মি। তবু ওব জন্য এই ব্যাকুলতা কেন? নিজের কাঠিন্য বজায় রাখতে চেষ্টা করল ও। যদিও ভিড়ের মধ্যে ওর চোখ দুটো খুঁজতে থাকল সেই একজনকেই। ও নিজের মনকে বোঝাতে চাইল, পাঁচ বছর আগে যে লোকটা ওর হৃদয় মন নিংড়ে নিয়েছিল, ওর ফুলের মতন নরম মনে ছুরি চালিয়েছিল, সেই মানুষকে ও ক্ষমা করবে না। ও বোঝাতে চাইল নিজেকে, জয়ন্তানুজকে অপমান করার জন্যই তাকে ওর দরকার। পুরনো দিনের সেই মোহকে প্রশ্রয় দেবার জন্য নয়।

সিক্সথ ইয়ারের শেষের দিকে সুগতর সঙ্গে ওর আলাপ। নিজে থেকে পরিচয় করেছিল সুগত। ঝড়ে বিধ্বস্ত মন তখন উর্মির। অতএব সুগতর সঙ্গলাভের প্রয়োজন হয়েছিল। সেই থেকে অনেক ঘুরেছিল ওরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে, মাঠে, করিডোরে। নিজের মনের রুচির সঙ্গে সুগতকে মেলাতে পারেনি প্রথমেই। সুগতর চালচলনে যে স্থূলতা ছিল, তাব সঙ্গে ও কিছুতেই ছন্দ মেলাতে পারেনি। তবু সুগতকে ও স্বাগতম্ জানাল। নিজের মনকে জোর করে সইয়ে নিল। ও জয়ন্তানুজকে ভুলতে চাইছিল আসলে। ভুলেও প্রায় গিয়েছিল। যদিও তা সাময়িক। অন্তত এ কথাই আজ মনে হচ্ছে উর্মির। সুগতর মতন ছেলেরা কয়েকটি দুর্বল মুহূর্তের সঙ্গী হতে পারে, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

ঘড়ি দেখতে দেখতে উর্মি খুব ভাঙা মন নিয়ে ট্রাম লাইন পেরোল। সাতটা দশ হয়ে গেছে। আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। কিন্তু রাস্তার উলটো দিকে যেতেই ও দেখলে,

জয়ন্তানুজ ট্যাক্সি থেকে নামছে। চিনতে ওর এতটুকু ভুল হয়নি। একেবারে হুবহু সেই চেহারাই রয়েছে। শুধু একটু মোটা হয়েছে এই যা। কোন ভূমিকা না করেই সে বলল, ছ'টা কুড়ি পর্যন্ত আপনার দেখা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত গড়িয়াহাট চক্কর দিলাম। তারপর আপনার বাড়ির সামনে তীর্থের কাকের মতন দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এই ফিরছি।

—যাক্, খুঁজেছেন তাহলে? উর্মি একটু বাঁকাভাবেই বলল।

—বাহ্, আমাব ওপরে বুঝি সে বিশ্বাস ছিল না?

—কথা না বাড়িয়ে বলুন আপনার কি বক্তব্য?

—এইখানে হাটের মধ্যে?

—হাটের মধ্যে কথা বলাই তো সব থেকে নিরাপদ।

ট্যাক্সির দরজা খুলে জয়ন্তানুজ বলল, এসো।—(এসো! একেবারে তুমি! কথাটা কানে বাজলো উর্মির) উর্মির ভাবতে অবাক লাগছে। আজই ওদের প্রথম আলাপ। অথচ দু'জনেই দু'জনের কত বেশী চেনা। জয়ন্তানুজের পরনে দামী মেরুন রঙের প্যান্ট। গায়ে সাদা শার্ট, গলায় টাই। দাঁড়ি কামিয়েছে নিখুঁতভাবে জয়ন্তানুজ। নীলচে ভাব রয়েছে ফর্সা গাল দুটোয়। সেই গভীর চোখ দুটো আগের মতই উদাসীন। ওরা পাশাপাশি বসে থাকল দুজনে। কেউ কারো সঙ্গে কোন কথাই বলল না।

উর্মি বুঝতে পারছে, জয়ন্তানুজ এখন খুব নার্ভাস। ও আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, ওর কপালে প্রচুর ঘাম জমেছে। তবু ওর উন্নতিই হয়েছে বলতে হবে। সাত বছর আগে তাকে এভাবে কোন মেয়ের পাশাপাশি বসে থাকাটা কল্পনা করা যেত না।

—কোথায় যাবে?—কৃত্রিম স্মার্টনেস বজায় রেখে জয়ন্তানুজ প্রশ্ন করে।

—যেখানে নিয়ে যাবেন। ওদের চোখাচোখি হয়।

—আমি যেখানে নিয়ে যাব, তুমি সেখানে যাবে?

—দেখা যাক, কোথায় আপনার ডেসটিনেশন?—বলল উর্মি। হাসল জয়ন্তানুজ।

ক্যাথিড্রাল চার্চের সামনে এসে জয়ন্তানুজ বলল, ট্যাক্সি রোককে। শান্তিনিকেতনী কাজ করা চামড়ার ব্যাগটা খুলতে যাচ্ছিল উর্মি। জয়ন্তানুজ বলল, তার কি কোন প্রয়োজন আছে?—জয়ন্তানুজের দিকে তাকিয়ে উর্মির কেমন সঙ্কোচ হ'ল।

নিয়নের আবছা আলোয় ঘাসের মধ্যে বসল জয়ন্তানুজ। খানিকটা দূরত্ব রেখে ওর পাশে উর্মি। গির্জায় প্রার্থনা হচ্ছে। ওরা চুপচাপ বসে দুজনে। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এমনি করেই কি সময় পেরিয়ে যাবে? জয়ন্তানুজ ভাবছে। আজও কি সে কিছুই বলবে না? উর্মি ভাবছে, সুগতর কথা। উর্মি ভাবছে, দুজনের পছন্দে এত মিল? ঠিক এইখানে, এই ঘাসের লনে সুগতও তাকে নিয়ে বসেছিল মাত্র কদিন আগেও। ও বলেছিল, জায়গাটা নাকি ওর খুব প্রিয়। উর্মি ভাবছে, জায়গাটা তেমনিই আছে, শুধু মানুষটাই বদল হয়েছে। ক্যাথিড্রাল রোডটাকে পেছনে করে ওরা আজ বসেছে দুজন। গির্জার চুড়োটার ওপর এক ফালি চাঁদের আলো আর নিয়ন আলো মিলে একটা স্বপ্নময় পরিবেশ তৈরী হয়েছে। ঠিক এই পবিবেশটা পছন্দ করে সুগতও। সুগত মানুষটার সবটাই স্থূল নয়। সে কিছুটা রোমান্টিকও। কিছু সময় পরে জয়ন্তানুজ একটা সিগারেট ধরায়।

নীরবে সিগারেট টেনে চলে জয়ন্তানুজ। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলে, ভেবে দেখলুম নিজেকে আর প্রবঞ্চিত করব না।

—মানে?—উর্মি অবাক হবার ভান করে।

—তোমায় ছাড়া আমার চলবে না।

—তাই নাকি? কথাটা ভাবতে এত বছর সময় লেগে গেল?

—সময় লাগতো না। আমি ঠিক সাহস পাইনি। ভেবেছি, যদি প্রত্যাখ্যান কর!

—আজই হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠলেন!

ওর ব্যঙ্গের উত্তরে জয়ন্তানুজ বলল, তুমি আমার স্ত্রী হবে এটাই আমি এতদিন কল্পনা করেছি।

উর্মি বলল, শুধু কল্পনা করেছেন?

—শুধু কল্পনা নয়। বিশ্বাস করেছি।

—কিন্তু সে বিশ্বাসের জন্ম হয়নি বাস্তবে।—বাকী কথাটুকু শেষ করল না উর্মি।

—তোমায় না পেলে আমি মরে যাব।—গভীর আবেগে কাঁপলো জয়ন্তানুজের গলা।

উর্মি ভাবলো, আশ্চর্য, ছেলেরা সবাই এক। ঠিক এই কথাই বলেছিল সুগত সেদিন, যেদিন প্রথম এসে ওরা এখানে বসেছিল দুজনে। উর্মি ভাবছে, এরপর কি ও বলবে, তোমার জন্য কত রাত ঘুমোয়নি আমি?—যেমন করে সুগত বলেছিল?

ওর দারুণ জানতে ইচ্ছে করছে, কি মাসে জন্ম জয়ন্তানুজের?

উর্মি বলল, কেউই কাউকে না পেলে মরে না।

মাথা নীচু করল জয়ন্তানুজ। উর্মির জেদী মনটা ক্রমশ ওকে কঠিন করে তুলতে থাকল। ও বলতে চাইল, আজ যদি আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিই? যদি বলি, আপনাকে না পেলেও আমি বেঁচে থাকব?—কিন্তু ও বলতে পারল না। জয়ন্তানুজ দেখতে থাকল, ওর লাইনার আঁকা দুটি নিটোল চোখের গাম্ভীর্য। লিপস্টিক মাখা আবেগহীন ঠোঁটে বিদ্রূপ। অনেকক্ষণ ধরেই ওর হাতে সিগারেট জ্বলছে। সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে আঙুলের ডগায় এসে জ্বলছে। জয়ন্তানুজ ভাবছে, আর কি বসে থাকার কোন অর্থ আছে? ওর ফর্সা কান দুটো লাল হয়ে উঠেছে। ওর মাথার চুল অবিন্যস্ত। হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে পড়ছে কপালে। পরাজিত সৈনিকের মতন ও তাকিয়ে আছে। পেছনে ক্যাথিড্রাল রোড। গাড়ির আসা যাওয়াব বিরাম নেই। হেড-লাইটের তীব্র আলো

ছিটকে এসে পড়ছে। সেই আলোর বন্যায় জয়ন্তানুজ উর্মিকে দেখছে।

উর্মি তাকিয়ে আছে দূরে। যেখানে মহানগরীর চলমান জীবনযাত্রা। চৌরঙ্গীপাড়ায় আলোর মালা। যানবাহনের বিচিত্র সুর। জনতার কলকাতা। ওর অন্যমনস্ক মন শুনছে, গির্জার বাইবেল পাঠ।

সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে ওর আঙুলের ডগায় এসে জ্বলছে। চামড়াটা পুড়ছে। একটা যন্ত্রণার মাছ হেঁটে যাচ্ছে জয়ন্তানুজের বুকে। বুক থেকে গলায়। তবুও জয়ন্তানুজ বলল, কিছু বল ?

উর্মি বলল, কি বলবো ?

এই পাঁচ বছরেও কি তোমার কোন কথা জমা হয়নি ?

চুপ করেই থাকল উর্মি। ও বলতে পারল না, এক ভদ্রলোক আমায় ভালবেসেছিল। আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারিনি। ও বলতে পারল না, আমি তোমায় প্রত্যাখ্যান করতেই এসেছিলাম।

ওর চাঁপার কলির মতন নরম আঙুলগুলোর ওপর নিজের হাতের স্পর্শ রাখলো জয়ন্তানুজ। কোন বাধাই দিল না উর্মি। ও শুধু নিষ্প্রাণ পুতুলের মতন বসেই থাকল। যদিও ও তখন ভাবছে, আমাদের মনটা যেন দেওয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলাম। সে শুধু দোলে আর দোলে। কোথায় থামতে হয় জানে না।

—